ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য

মোহাইমিন পাটোয়ারী



ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য ◆ মোহাইমিন পাটোয়ারী ঐতিহ্য

ঐতিহ্য

ISBN 978-984-776-804-5

9 789847 768045



আপনি কি জানেন একফালি কাগজ কিভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ হলো? অর্থনৈতিক বৈষম্য লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে কেন? আর কেনই বা উন্নত বিশ্ব এত ঋণগ্রস্থ হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্নগুলো খুব তাত্ত্বিক এবং বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে। অথবা মনে হতে পারে এগুলো জানা কি আমাদের খুব প্রয়োজন? আসলে প্রশ্নগুলো মোটেও বিচ্ছিন্ন কিংবা তাত্ত্বিক নয়; সম্পূর্ণ জীবন ঘনিষ্ঠ এবং একই সুতোয় গাথা বাস্তবতা। আমাদের জীবনে নিয়মিত গভীর প্রভাব ফেলা এই না-দেখা বাস্তবতাগুলোকে ছোটছোট গল্পের আকারে সাজিয়ে সবার কাছে সহজভাবে তুলে ধরতে রচনা করা হয়েছে এই বই।

বইটিতে গ্রন্থাকার আমাদের এই নাজানা বাস্তবতাকেই গল্পের মতো প্রাণবন্ত এবং ছবির ন্যায় রঙিন করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

আপনি
গুরুত্বপূ
বেড়ে য
ঋণগ্রস্থ
বিচ্ছিন্ন
পারে
আসলে
নয়; স
বাস্তবত
ফেলা
গল্পের
তুলে ধ

বইটি
বাস্তব
ন্যায়

ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য

মোহাইমিন পাটোয়ারী



ঐতিহ্য

আপনি কি জা
গুরুত্বপূর্ণ হলো
বেড়ে যাচ্ছে
ঋণগ্রস্থ হয়ে
বিচ্ছিন্ন বলে
পারে এগুলো
আসলে প্রশ্নগু
নয়; সম্পূর্ণ জী
বাস্তবতা। আ
ফেলা এই ন
গল্পের আকা
তুলে ধরতে র

বইটিতে প্র
বাস্তবতাকেই
ন্যায় রঙিন ক

ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য
মোহাইমিন পাটোয়ারী

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মার্চ ২০২২

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২৮
ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
তিনশত টাকা

BANKBABOSTHA O TAKAR GOPON ROHOSSO
by Mohaimin Patwary
Published by Oitijjhya
Date of Publication : February 2022
Second Print : March 2022

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Price: Taka 300.00 US$ 10.00
ISBN 978-984-776-804-5

উৎসর্গ

Paul Grignon
যিনি বর্তমান সমস্যাগুলোকে চিত্রায়িত করেছেন
এবং
Satoshi Nakamoto
যিনি এই সমস্যাগুলোর সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন

Md Shafiul Alam

12:32 Am
রাত
november, 4th, 2025

আপনি কি জা
গুরুত্বপূর্ণ হলো?
বেড়ে যাচ্ছে কে
ঋণগ্রস্থ হয়ে যা
বিচ্ছিন্ন বলে ম
পারে এগুলো ভ
আসলে প্রশ্নগুলে
নয়; সম্পূর্ণ জীব
বাস্তবতা। আমা
ফেলা এই না-
গল্পের আকারে
তুলে ধরতে রচন

বইটিতে গ্রন্থা
বাস্তবতাকেই গ
ন্যায় রঙিন করে

লেখকের কথা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় William T. Still-এর প্রামাণ্যচিত্র The money masters দেখার সময় নিচের উক্তিটি আমার চোখে পড়ে।

'It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.'

'এটা স্বস্তিকর যে, দেশের (আমেরিকার) জনগণ ব্যাংকিং এবং মুদ্রাব্যবস্থার রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানে না। কারণ তারা যদি জানতো, আগামীকাল রাত পোহাবার আগেই দেশে গণবিপ্লব শুরু হয়ে যেত।'
–হেনরি ফোর্ড (ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা)

হেনরি ফোর্ড এমন কথা কেনো বললেন তা জানতে তখন থেকেই আমার মন খচখচ করতে থাকে। সেই সময় এ সম্পর্কে কিছু না বুঝলেও এতটুকু নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম যে, ব্যাংকিং ও মুদ্রাব্যবস্থার মাঝে বিশেষ কিছু রহস্য আছে, অর্থনীতির ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও যা ছিল আমার অধরা। পরবর্তীকালে যেই ব্যাপারটা আমাকে সবচেয়ে আশ্চর্যান্বিত করেছে তা হল মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানেই ভালোভাবে পড়ানো হয় না। 'নরওয়ে স্কুল অব ইকোনমিক্স'-এ মুদ্রা বিষয়ে একটি মাত্র কোর্স ছিলো যার কন্টেন্ট ততদিনে আমার খুব ভালো ভাবে জানা। পরবর্তীকালে আমি জার্মানির স্বনামধন্য 'মানহাইম বিজনেস স্কুলে' দ্বিতীয় মাস্টার্সের উদ্দেশ্যে যাই। সেখানেও এই বিষয়ে কোনো কোর্স ছিলো না। অথচ এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল সেই দুই দেশের সেরা বিজনেস স্কুল।

এমনটি না যে মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা গুরুত্বপূর্ণ না। অর্থনীতি বোঝার খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঠ এগুলো। কিন্তু তারপরেও কেন জানি মুদ্রাব্যবস্থার কারসাজি, সুদের কুফল, ব্যাংকিং ব্যবস্থার রহস্য ইত্যাদি সবসময় এড়িয়ে যাওয়া হতো। বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা অর্থনীতিবিদ Richard Werner ও এমন মন্তব্য করেছেন। এই বিষয়ে তিনি আরও যোগ করে বলেন যে:

'Economics that is taught at university is not the real economics. It is a whole second economics of how things really work.'

– Richard Werner, Central Bank watcher and investment strategist, Author and researcher

'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেভাবে অর্থনীতি শিখানো হয় তা বাস্তবভিত্তিক না। বিশ্বব্যবস্থা কিভাবে চলছে তা জানার জন্য দ্বিতীয় আরেক রকম অর্থনীতি পড়া উচিত।'

– রিচার্ড ভার্নার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক গবেষক, লেখক এবং বিনিয়োগ কুশলী

এই দ্বিতীয় আরেক রকম অর্থনীতিটা কি? তা জানার আগ্রহই আমাকে তাড়না করতে থাকে। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে না পড়ানো হলেও আমি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকি। এভাবে দীর্ঘ দিনের সাধনায় এক সময়ের ভাসা ভাসা জ্ঞান ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যায়।

বর্তমানে এই জ্ঞানকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্মে আমি লেখালেখি করছি। পাঠকদের পক্ষ থেকে উচ্ছ্বসিত সাড়া পাওয়ার পর পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করে সরল ভাষায় একটি বই লেখার উদ্যোগ নেই।

বইটি লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল ভাষার সরলতা বজায় রাখা। গল্পের ছলে অর্থনীতির মৌলিকতা বজায় রেখে বই লেখাটা মোটেও সহজ কোনো কাজ না। কিন্তু তারপরেও সবার কাছে এই বাণী পৌঁছে দিতে সেই কঠিন সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত অটল থেকেছি। শত শ্রমের বিনিময়ে রচিত এই বইটি সকলের কাছে আলো প্রদানকারী একটি কর্ম হিসেবে টিকে থাকবে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করি। আল্লাহ কবুল করুক।

মোহাইমিন পাটোয়ারী

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের। আমরা তাঁর সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের প্রবৃত্তির মন্দ কাজগুলো হতে। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথহারা করতে পারে না এবং আল্লাহ যাকে পথহারা করেন তাকে কেউ পথের দিশা দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি দুরূদ ও সালাম, তিনি শেষ নবী যার উপর পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তিনি আমাদেরকে দ্বীনের যেসব তথ্য, হুকুম ও আহকাম জানিয়েছেন, আমরা সেটা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি।

পবিত্র কুরআনে কঠোরভাবে সুদ বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

> 'যারা সুদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয়, এ শাস্তি এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় সুদের মতই', অথচ কারবারকে (ব্যবসা) আল্লাহ হালাল করেছেন এবং তিনি সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী পৌঁছল এবং সে বিরত হল, পূর্বে যা (সুদের আদান-প্রদান) হয়ে গেছে, তা তারই, তার বিষয় আল্লাহর জিম্মায় এবং যারা আবার আরম্ভ করবে তারাই অগ্নির বাসিন্দা, তারা তাতে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং খয়রাতকে বৃদ্ধি করেন, আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপীদেরকে ভালবাসেন না। যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়িম করে এবং জাকাত আদায় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সওয়াব নির্ধারিত আছে। তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তিতও না। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বাকি সুদ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও। অতঃপর যদি না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে লও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবাহ কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন পাবে, এতে তোমাদের দ্বারা অত্যাচার হবে না, আর তোমরাও অত্যাচারিত হবে না। যদি সে (ঋণ গ্রহণকারী) দরিদ্র হয়, তবে স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিবে আর মাফ করে দেয়া তোমাদের পক্ষে অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে!'

সুরা বাক্বারা, আয়াত ২৭৫-২৮০

বাংলা তরজমা - তাফসীরে তাইসিরুল কুরআন

সহীহ হাদিস-সমূহেও সুদের ব্যাপারে এই কঠোর বার্তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) —সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষীদ্বয় ও সুদের (চুক্তি বা হিসাব) লেখককে অভিসম্পাত করেছেন।

জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১২০৬,

ইবনু মা-জাহ হাদিস নং ২২৭৭

হাদিসের মান: সহীহ হাদিস

অর্থাৎ, বার্তা সুস্পষ্ট, সুদ-এর সাথে কোনোভাবেই জড়িত থাকা যাবে না। আল্লাহর আদেশ মানা আমাদের জন্য শিরোধার্য, সুদভিত্তিক লেনদেন আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন সেটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাহলে এই বইটা কেন রচনা করা হল? এই বইয়ে সম্মানিত লেখক আল্লাহর আদেশের যৌক্তিকতা যাচাই করেননি, এমনকি আল্লাহর আদেশ যে আমাদের জন্য কল্যাণকর সেটাও প্রমাণ করার চেষ্টায় যাননি। কারণ, আল্লাহ আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন ও সবচেয়ে বেশি জানেন, সুতরাং তাঁর আদেশ যে কল্যাণকর সেটা আলাদা করে প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই।

এই বইয়ের ছোট্ট একটা অনুশীলন করা হয়েছে, আধুনিক রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চমৎকার করে দেখিয়েছেন অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের ক্ষতি ও ক্ষতির ব্যাপ্তি। যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবিতে এমনভাবে গল্পটা সাজানো যাতে আমরা সমাজে সুদের এই প্রকাশ্য ক্ষতি সচেতনভাবে চিনতে পারি ও সুদ থেকে দূরে থাকতে পারি।

সম্পাদক হিসেবে আমার ভূমিকা ছিল মূলত পাঠকের। অর্থনীতির খটমটে পরিভাষা ও ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক প্রয়োগের সম্মিলনে এই রচনাটা যাতে সুখপাঠ্য হয় সেটা নিয়ে কাজ করতে পেরে আমি যারপরনাই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ, আলহামদুলিল্লাহ। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বইটা সুদের অকল্পনীয় গভীর ও সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক ক্ষতির দিক বুঝাতে পাঠককে সমর্থ হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মোহাইমিন ভাইয়ের এই বইটা কবুল করে নিন এবং তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মিনহাজ রেজা

'ওহে মনুষ্যজাতি! ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো হতে হালাল উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বস্তুত সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

– সুরা বাক্বারা, আয়াত ১৬৮

বাংলা তরজমা - তাফসীরে তাইসিরুল কুরআন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
শুরুর কথা.../ ১৩
অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো গঠন/ ১৬
রূপসাগরে একদিন/ ১৮
সুদ, ব্যবসা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য/ ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
ব্যবসা/ ২৩

তৃতীয় অধ্যায়
টাকা/ ৩৩
ক্রমবর্ধনমান মুদ্রা ও চক্রবৃদ্ধি সুদ/ ৩৭
অর্থনীতি/ ৪৭

চতুর্থ অধ্যায়
ব্যবসা কাঠামো বিশ্লেষণ/ ৫১
মূল্যস্ফীতি/ ৫৭
যত উৎপাদন তত কেন মূল্যস্ফীতি/ ৫৯
প্রশ্নোত্তর/ ৬১

পঞ্চম অধ্যায়
ব্যাংক এবং দেউলিয়াত্ব/ ৬৫
ভেলার ভেলকি/ ৬৮
চক্রাকার ঋণ এবং সুদ/ ৭০
সুদরূপী আনাকোন্ডা এবং সজীবের পরিণতি/ ৭০
জম্বি কোম্পানি/ ৭৩
আরও গভীরে দেখুন/ ৭৬
শেষ পরিণতি/ ৮০
শেষ রক্ষা করা যাবে?/ ৮১
মুদ্রা যখন প্রাকৃতিক/ ৮২
মুদ্রা যখন সরকারি/ ৮২
মুদ্রা যখন ব্যাংকের হাতে/ ৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
অদৃশ্য মুদ্রা/ ৮৪
হাওয়াই টাকা/ ৮৫
সুদের হালখাতা/ ৯১
ব্যাংক-টাকার অর্থনৈতিক মেকানিজম/ ৯৫
সমাজব্যবস্থা/ ৯৬
সরকার/ ৯৯
অর্থনৈতিক মন্দা ও বেইল আউট/ ১০০
বিভিন্ন অর্থব্যবস্থা/ ১০২

সপ্তম অধ্যায়
চেকের প্রবর্তন/ ১০৫
ডেপজিট ব্যাংকিং/ ১০৯
মুক্তবাজার অর্থনীতি/ ১১৪

অষ্টম অধ্যায়
টাকার গোপন রহস্য/ ১১৮
আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার আবিষ্কার/ ১২১
কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট/ ১২৭
আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা/ ১৩০
শুভঙ্করের ফাঁকি/ ১৩১
আধুনিক বিশ্ব/ ১৩৩
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কারসাজি/ ১৩৬
তারল্য সংকট (Liquidity Crisis)/ ১৩৭
পুঁজি ঘাটতি (Capital Shortfall)/ ১৩৮
মনেটারি পলিসি/ ১৩৯
টিকা - বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা/ ১৪১
ফিসকাল পলিসি/ ১৪৫
শেষ কথা/ ১৪৭
শব্দকোষ ও প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা/ ১৫০

আপনি কি জা
গুরুত্বপূর্ণ হলে
বেড়ে যাচ্ছে
ঋণগ্রস্থ হয়ে
বিচ্ছিন্ন বলে
পারে এগুলো
আসলে প্রশ্নগু
নয়; সম্পূর্ণ ভ
বাস্তবতা। আ
ফেলা এই ন
গল্পের আকা
তুলে ধরতে র

বইটিতে প্র
বাস্তবতাকেই
ন্যায় রঙিন ক

প্রথম অধ্যায়

শুরুর কথা...

আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কি? টাকা উৎপন্ন হয় কিভাবে? কাগুজে টাকার মাঝে মূল্যমান প্রবেশ করে কেন? অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে কেন? এই প্রশ্নগুলো হয়তো আমার মত আপনাকেও তাড়না করে বেড়িয়েছে এবং এগুলোর উত্তর কিছুটা খুঁজে পেয়েছেন কিংবা পাননি। আপনি যে দলভুক্তই হয়ে থাকুন না কেন, আজকে আমরা এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত জানবো। আর আমাদের এই জানার যাত্রা খুব সাধারণ একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি, 'সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কি?'

প্রথমত এই প্রশ্নটি খুব সরল কিংবা অযৌক্তিক মনে হতে পারে। অথবা মনে হতে পারে এমন প্রশ্ন করারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তবে প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটি মোটেও সরল কিংবা অযৌক্তিক নয়। চিন্তা করে দেখুন– সুদের সাথে ব্যবসার তুলনা করতে গিয়ে প্রথমে যেই পয়েন্টটি উঠে আসে তা হচ্ছে 'সুদে কোন ঝুঁকি নেই'। কিন্তু এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ 'সঠিক' নয়। কারণ যে ব্যক্তি ঋণ প্রদান করে, সে যদিও চেষ্টা করে ক্ষতির শিকার না হতে, কোনো ঋণদাতাই তা শতভাগ নিশ্চিত করতে পারে না। একজন গ্রাহক ঋণ নেবার পরে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে, অর্থ আত্মসাৎ করে পালিয়ে যেতে পারে কিংবা কোনো সম্পদ না রেখে মৃত্যুবরণ করতে পারে। এই সবগুলোই ঋণদাতার জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ। তাই, 'সুদে কোন ঝুঁকি নেই' কথাটি সম্পূর্ণ সত্য না। সুদে ধার দিলেও ঋণদাতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ আছে।

সুদের ব্যাপারে দ্বিতীয় যেই অভিযোগটি করা হয় তা হচ্ছে বস্তুগত পণ্যের (যেমন– ঘরবাড়ির) ক্ষয় (depreciation) আছে। একটি বাড়ি ধীরে ধীরে

পুরানো হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি একসময় ভেঙে পড়ে যায়। তেমনি করে একটি গাড়ি কিংবা একটি কারখানাও একসময় অচল হয়ে যায়। সেই তুলনায় টাকার কোনো ক্ষয় নেই।

কিন্তু খেয়াল করুন, সম্পদের যেমন ক্ষয় আছে, তেমনি টাকারও মূল্যমানেরও ক্ষয় আছে। এই বছর যেই বস্তুটির মূল্য ১০০ টাকা, ১০ বছর পরে তার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে যাবে ২০০ টাকা। এমনকি একসময় হয়তো ১০০ টাকার নোটও অচল হয়ে যাবে। এমনটি হবার কারণ কি? কারণ হচ্ছে, টাকার মূল্যমানের ক্ষয়। অর্থাৎ, ব্যবসায় ক্ষয় আছে কিন্তু সুদে কোনো ক্ষয় নেই এই কথাটিও সঠিক না। সুদ নিয়ে অপর যেই অভিযোগটি উঠে, তা হলো একজন সুদী-মহাজন গ্রাহকের থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায় করে থাকে। গ্রাহক লাভ করেছে কি লোকসান করেছে, তা তিনি বিবেচনা করেন না। সকল পরিস্থিতিতেই কেবল নিজের লাভ বুঝেন।

এই কথাগুলো সত্য, তবে একই বাস্তবতা ব্যবসার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। একজন বিপণিবিতানের মালিকও ব্যবসায়ীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করেন না। লাভ হোক কি লোকসান, মাস শেষে তিনি এক প্রকার জোরপূর্বক ভাড়া আদায় করে থাকেন। তাই একমাত্র সুদী-মহাজন টাকা আদায়ের ব্যাপারে কঠোর, কিন্তু ব্যবসায়ী নয়, এই কথাটিও সঠিক নয়।

সুদের ব্যাপারে চতুর্থ অভিযোগটি আসে যে, ব্যবসায় পরিচর্যা খরচ আছে। যেমন– একটি বাড়ি মেরামত করা, রং করা বা অন্য কোনো সমস্যা হলে ঠিকঠাক করা বাড়িটির পরিচর্যা খরচ। অন্যান্য সম্পদের বেলায়ও অনুরূপ পরিচর্যা করতে হয়। যেমন একটি গাড়ি ভাড়া দিলে মেরামত করতে হয়, একটি বাগান ভাড়া দিলে বাগানের পরিচর্যা করতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু টাকার বেলায় এরূপ কোনো পরিচর্যা খরচ নেই।

এই অভিযোগটিও 'পুরোপুরি' সঠিক নয়। টাকার সরাসরি পরিচর্যা খরচ না থাকলেও এর নিরাপত্তা প্রদান, একটি ব্যাংকের কর্মচারীদের বেতন, অফিস ভাড়া, কারেন্ট বিল ইত্যাদি বাবদ প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। আবার একজন গ্রাহক দেউলিয়া হয়ে গেলে সেই ক্ষতির ভারটাও ব্যাংককে বহন করতে হয়। এই সব কিছুই সুদভিত্তিক ঋণের পরিচর্যা খরচ। তাই সম্পদের পরিচর্যা খরচ আছে কিন্তু ঋণে কোনো খরচ নেই তা যুক্তির টোপে টিকবে না।

সুদের ব্যাপারে আপত্তি জানাতে গিয়ে আরেকটি পয়েন্ট উঠে আসে যে সুদে আয় নির্দিষ্ট কিন্তু ব্যবসার আয় অনির্দিষ্ট।

চিন্তা করে দেখুন, আপনি একটি বাড়ি কিংবা দোকান তৈরি করে যখন তা ভাড়া দিয়ে থাকেন, চাহিদা অনুযায়ী আপনি প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া পেয়ে থাকেন। সুদের মত বাড়ি ভাড়ার রিটার্নেও কোনো তারতম্য হয় না। আবার আপনি যদি একটি গাড়ি কিনে রেন্ট-এ-কার কোম্পানিকে ভাড়া দিয়ে থাকেন, তাহলেও আপনি প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া পেয়ে থাকেন।

শুধু তাই নয়, সরকারি বা বেসরকারি, যেকোনো প্রজেক্টে বিনিয়োগের পূর্বে সম্ভাব্য খরচ ও লাভের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক প্রাক্কলন দাঁড় করানো হয়। বিনিয়োগে সুদ থাকুক বা নাই থাকুক, প্রাক্কলনের সুবাদে জানা যায়, বিনিয়োগ করলে সম্ভাব্য লাভ কত হতে পারে, আর ক্ষতি হলেও বা কি ক্ষতি হতে পারে। প্রাক্কলনে যদি দেখা যায়, সব খরচ করার পরেও লাভ থাকে, তখনই কেবল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। অর্থাৎ, শুধু সুদের ক্ষেত্রেই নয়, অংশীদারিত্ব ব্যবসা পদ্ধতিতেও রিটার্ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেই বিনিয়োগ করা হয়।

আপনি ভাবতে পারেন তারপরেও কিছু পার্থক্য থেকে যায়। সুদের রিটার্ন নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব কিন্তু ব্যবসার রিটার্ন নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব না। এই ব্যাপারটি আসলে এমন নয়। সুদের রিটার্নও নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে দেউলিয়া হওয়ার হার তারতম্য করে এবং ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে তা আগের থেকে বলা অসম্ভব। পাশাপাশি সুদে মনিটরিং, আইনি ব্যয়, কর্মচারী বেতন-বোনাস সহ নানা প্রকার আনুষঙ্গিক খরচ রয়েছে যার কোনোটাই আগের থেকে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই মোটা দাগে সুদে ঋণ দিলে আগে থেকেই রিটার্ন জানা যায় কিন্তু ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে জানা যায় না এই কথাটা সত্য না।

সর্বশেষ যে অভিযোগটি আসে তা হচ্ছে সুদ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করুন, যেকোনো সফল ব্যবসা করেই একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্পদশালী হওয়া সম্ভব। ব্যবসায়ীরা যেহেতু সমাজের অপরাপর সদস্যের সাথে লেনদেন থেকে অর্জিত অর্থেই ধনী হয়ে থাকেন সেহেতু যেকোনো সফল ব্যবসা করলেই ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে।

তাহলে যেই প্রশ্নটি আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হলো অর্থনৈতিকভাবে সুদের সাথে ব্যবসার তফাৎটা কোথায়? দুই জন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে সুদের লেনদেন করে তারা সমাজের কোনো ক্ষতি করল কি? ধনী হবার কারণে একজন ব্যবসায়ী যদি অপরাধী না হয়ে থাকেন,

ঋণ-ব্যবসায়ী কেন সবার দৃষ্টিতে অপরাধী বলে বিবেচ্য হবেন? সেই কোটি টাকার উত্তরটাই জানবো। তবে তার জন্য প্রথমে প্রয়োজন অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো গঠন করা, যা এই আলোচনাকে বুঝতে সাহায্য করবে।

অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো গঠন

অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলো বোঝার একটি শক্তিশালী পদ্ধতি হলো প্রথমে খুব সরল পরিসরে চিন্তা শুরু করা এবং পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে নতুন মাত্রা যুক্ত করে বড় পরিসরে নিয়ে আসা।

একটা উদাহরণ দিলে ধারণাটি পরিষ্কার হবে। ধরুন, আজ বাজারে গরুর মাংসের দর কেজিতে ৮০০ টাকা। এই ৮০০ টাকা দরে আপনার শহরে প্রতিদিন তিনশ কেজি গরুর মাংস বিক্রি হয়। একদিন দেখা গেল, দাম কমে প্রতি কেজিতে হয়ে গেল মাত্র ৫০০ টাকা। তখন কী হবে? ঠিক ধরেছেন, সবাই মাংস কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। অর্থাৎ, ৮০০ টাকা দরে বাজারে যতো মাংস বিক্রি হত, দাম কমে ৫০০ টাকা হলে তার তুলনায় বিক্রি অনেক বেড়ে যাবে। এবার যদি বলি, গরুর মাংসের দাম বেড়ে কেজিতে ১৫০০ টাকা হয়ে গেছে? তখন কী হবে? জি, মাংসের বাজারে ক্রেতা তো দূরে থাক, মাছিও উড়বে না। অর্থাৎ, ৮০০ টাকা দরে যতো কেজি মাংস বিক্রি হতো, দাম বেড়ে ১৫০০ টাকা হলে তার তুলনায় বিক্রি কমে যাবে।

এভাবে খুব সহজেই আমরা বলতে পারলাম যে,

'দাম কমলে বিক্রি বেড়ে যাবে। আবার দাম বাড়লে বিক্রি কমে যাবে।'

খেয়াল করুন, উপরে আমরা মাত্র ২টা জিনিস সামনে এনেছি। দাম ও বিক্রির পরিমাণ। এতেই দেখলাম দামের প্রভাবে, বিক্রি বাড়ে ও কমে। আপনি-আমি সবাই উপরের উদাহরণের সাথে পরিচিত। কিন্তু এখানে আমরা আরো একটা কাজ করেছি। বলতে পারেন সেটা কী? আমরা পারিপার্শ্বিক সব কিছু 'অপরিবর্তিত' থাকবে ধরে নিয়েছি। সেগুলো কী?

ধরুন, আপনার এলাকায় গরুর মাংসের দাম যেদিন কমে গেল, তার আগের দিন কমিশনার সাহেব সবার বাসায় ২০ কেজি করে মাংস উপহার পাঠালেন। তখন কি এতো পরিমাণ মাংস বিক্রি হতো?

আর যদি, সেদিন কুরবানির ঈদের পরদিন হত? তাহলে কি আপনারা আগের মতো এতো বেশি মাংস কিনতেন? অবশ্যই না।

অর্থাৎ, আমরা যখন দাম আর বিক্রির পরিমাণ হিসেব করছি, তখন এরকম ব্যাপারগুলো যে ঘটতে পারে, তা হিসেবের বাইরে রেখে দিয়েছি। আমরা ধরে নিয়েছি এমন ব্যাপার ঘটবে না বা 'সংশ্লিষ্ট সবকিছু অপরিবির্তিত

থাকবে'। অর্থনীতির ভাষায় একে বলে, 'সেটেরিস পারিবাস' (Ceteris Paribas)। তাই 'দাম বাড়লে বিক্রি কমে এবং দাম কমলে বিক্রি বাড়ে', বলতে আমরা আসলে বুঝি, 'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবির্তত থাকলে যদি দাম বাড়ে তাহলে বিক্রি কমে যাবে এবং যদি দাম কমে তাহলে বিক্রি বেড়ে যাবে।' আশা করি অর্থনীতির এই চমকপ্রদ চিন্তার কাঠামোটা আপনি বুঝতে পেরেছেন।

Ceteris Paribas.

এখন এই কাঠামোটা কিভাবে কাজে লাগে তার একটি উদাহরণ দেই– ধরুন, উপরের উদাহরণ অনুসারে আমরা জানতে চাই, তেলের দাম বেড়ে গেলে গরুর মাংস খাওয়া বাড়বে নাকি কমবে? আচ্ছা, তেলের সাথে গরুর মাংসের কী সম্পর্ক? ঠিক ধরেছেন, তেল দিয়েইতো মাংস রান্না করা হয়। সুতরাং, তেলের দাম বাড়লে গরুর মাংস রান্নার মোট খরচ বেড়ে যাবে। তাই আগের মতো মাংস খেতে হলে আপনাকে বাড়তি পয়সা গুনতে হবে। আপনার মাসিক বাজেট যদি আগের মতই যদি থাকে, আপনি গরুর মাংস কম রান্না করবেন অথবা, অন্যান্য খাবার কম খেয়ে মাংস রান্না করবেন, অথবা বাসার অন্যান্য ব্যয় কমাবেন– এরকম একশ-একটা পথ আছে, তাইতো?

এবার আমরা চিন্তার কাঠামোটা নিয়ে আসি। দেখুন কত সুন্দর কাজে লাগে।

প্রশ্ন : 'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে, যদি তেলের দাম বাড়ে তাহলে গরুর মাংসের বিক্রির কি হবে?'

উত্তর : যখনই বলছি, 'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে', এর মানে হল, গরুর মাংসের সরবরাহ, আয়-রোজকার, মসলা খাওয়ার পরিমাণ, রান্নায় তেলের পরিমাণ, বাসার অন্যান্য খরচ এগুলা সব আগের জায়গায় থাকবে। কিছুর পরিবর্তন হবে না। সব লক করে রেখে আমরা শুধু তেলের দাম বাড়াবো আর দেখবো এতে করে গরুর মাংসের বিক্রিতে কি পরিবর্তন হয়।

তখন আমরা দেখতে পাব, তেলের দাম বাড়লে, তেলের বিক্রিও কমে যায়। আপনি গরুর মাংস রান্না করতে যদি আগের মতই তেল ব্যবহার করেন এবং মাসিক বাজেট আগের মতই থাকে তাহলে কি আগের সমপরিমাণ মাংস রান্না করতে পারবেন? না, তা সম্ভব না। তার মানে, আপনি মাংস রান্না করা কমিয়ে দিবেন। সুতরাং, কাঠামোর মধ্যে রেখে আমরা উত্তর পেলাম যে,

'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে যদি তেলের দাম বাড়ে তাহলে গরুর মাংসের বিক্রি কমে যাবে'।

অভিনন্দন পাঠক, আপনারা কাঠামোটি খুব সহজেই ধরতে পেরেছেন।

এভাবে, অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় আমরা কাঠামোর মধ্যে এনে চিন্তা করি। সব চিন্তা শুরু হয় সরল পরিসরে একটা-দুইটা মাত্রা দিয়ে। আলোচনায় সামনের দিকে যেতে যেতে আমরা নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে পরিসর বাড়াই এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করি। আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে সুদের প্রভাব কী? ব্যবসার সাথে এর পার্থক্য কি? তা বুঝতে প্রথমেই তাই আমরা তৈরি করব একটা অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো যার নাম রূপসাগর।

রূপসাগরে একদিন

রূপসাগর একটি দ্বীপ রাষ্ট্র যা আয়তনে বিশাল এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তবে সব দিক থেকে সমৃদ্ধ হলেও এই রাষ্ট্রের জনসংখ্যা খুব সীমিত। আপাতত সেখানে মোট দশটি পরিবার বসবাস করে। এই পরিবারগুলোর কেউ মাছ ধরে, কেউ পশুপালন করে, কেউ তাঁত বুনে, কেউ কাঠের কাজ করে, কেউবা ব্যবসা করে এবং সারাদিনের কাজ শেষে তারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজার থেকে কেনাকাটা করে ঘরে ফিরে। সবকিছু ঠিকঠাক চললেও এই দেশের একটি সমস্যা হচ্ছে এখানে লেনদেন করার কোনো সাধারণ বস্তু অর্থাৎ 'টাকা' নেই। কেউ মাছের বিনিময়ে চাল, কেউ ধানের বিনিময়ে ডাল, কেউ শ্রমের বিনিময়ে খাদ্য এভাবে লেনদেন করে কাজ চালিয়ে যায়। এভাবে সমস্যা বেঁধে যায় তখন, যখন বিনিময়ের মত উপযুক্ত পক্ষ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো একদিন জেলের জালে বেশি মাছ ধরা পড়লেও তার ঘরে চাল লাগে। কিন্তু বাজারে গিয়ে জেলে মশাই যদি আবিষ্কার করেন, চাল বিক্রেতার কাছে মাছের প্রয়োজন নেই তার প্রয়োজন কাপড়ের। তখন কি উপায়?

উপায় হচ্ছে প্রথমে এমন একজন তাঁতিকে খুঁজে বের করা যার মাছের প্রয়োজন। তারপর সেই তাঁতির থেকে মাছের বিনিময়ে কাপড় কিনে নেওয়া। তারপরে সেই কাপড় দিয়ে কৃষকের থেকে চাল কিনে নেওয়া।

প্রক্রিয়াটি একটু জটিল হলেও সমাধানযোগ্য। কিন্তু এমন যদি হয়, কোনো তাঁতিই মাছ কিনতে আগ্রহী না? সেক্ষেত্রে সত্যই খুব সমস্যা হয়ে যাবে, কারণ মাছ দীর্ঘসময় সংরক্ষণ করে রাখা যায় না।

বিনিময় প্রথায় লেনদেন করা সমস্যাজনক দেখে দ্বীপের সবাই মিলে পরামর্শ করতে বসল, 'কী করা যায়?' একজন বুদ্ধি দিলো, রূপসাগরের অধিবাসীরা এক রকম সোনালি ধাতু দিয়ে গহনা বানায় যা ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই পছন্দ করে। কেউ যদি এই সোনালি ধাতুর একটি গুটির বিনিময়ে এক মণ চাল কিনতে চায়, যে কেউই রাজি হয়ে যাবে। একইভাবে সেই তাঁতির মাছ কেনা প্রয়োজন, সে যদি এমন একটি গুটির বিনিময়ে মাছ কিনতে চায়, জেলেও মাছ বিক্রি করতে রাজি হয়ে যাবে। এক কথায়, এই সোনালি জিনিসটা সর্বজনগ্রাহ্য এবং সাধারণ বস্তু। তাই লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে এটাকে চালু করলে বাজার করতে আর কারো ঝক্কি পোহাতে হবে না। তাই সবার সম্মতিক্রমে রূপসাগরে সোনালি জিনিসটা (স্বর্ণমুদ্রা) চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এককথায় রূপসাগরের অর্থনীতি বিনিময় প্রথার যুগ থেকে মুদ্রাব্যবস্থার যুগে প্রবেশ করলো। আর্থিক লেনদেনের সমস্যা সমাধানের এরকম প্রক্রিয়াতেই কালের আবর্তে মানুষ মুদ্রায় লেনদেন করা শুরু করে।

এদিকে মুদ্রাপ্রথা চালু করতে গিয়ে নতুন বিপত্তি বাঁধলো। সবার কাছে স্বর্ণ নেই। একজন বুদ্ধি দিলো, 'এখনও তো 'কেনা-বেচা' শুরু হয়নি, সব স্বর্ণ জড়ো করে সবার মাঝে সমান ভাগে ভাগ ভাগ করে দেই, যাতে এক জায়গা থেকে শুরু করতে পারি।'

সবাই ভেবে চিনতে দেখলো তাদের বাগবাগিচা, বাড়িঘর, সন্তান-প্রতিপত্তি সব আগের জায়গাতেই থাকবে। কেবল সামান্য কিছু সোনা নিজেদের মাঝে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এই কষ্টকর সিদ্ধান্তের বিনিময়ে এরপর থেকে যদি সবার কেনাকাটা করতে খুব সুবিধা হয়, মেনে নিতে ক্ষতি কি? একবারের জন্যই তো। তাই কষ্ট লাগলেও তারা সবাই সিদ্ধান্তটি মেনে নিল এবং সেই পরিকল্পনা মোতাবেক সবার স্বর্ণ জড়ো করে মোট ১,০০০টি সোনার মুদ্রা তৈরি করে ১০টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হলো।

সুদ ব্যবসা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

মুদ্রাব্যবস্থায় প্রবেশ করার পর রূপসাগরে লেনদেন করতে আর কোনো সমস্যা পোহাতে হচ্ছে না। প্রতিটা পরিবার প্রতিদিন প্রয়োজনমত কেনাবেচা করে নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরছে। সবে মাত্র লেনদেন প্রক্রিয়া (বার্টার সিস্টেম) থেকে উঠে আসায় কোনো পরিবার যেই পরিমাণ জিনিস কিনে গড়পড়তা তার

সমপরিমাণ জিনিসই বিক্রি করে। তাই পরিবারগুলোর কাছে কেনা-বেচার করার পর মোটামুটি ১০০টি মুদ্রাই থাকে।

যাই হোক, জীবনে যেমন উত্থান-পতন থাকে, সব দিন একরকম যায় না, তেমনি রূপসাগরেও সবার দিন একসমান যায় না। এই স্বাভাবিক নিয়মে তরুণ ব্যবসায়ী 'জীবন' একবার বিপদে পড়ল। বিপদ থেকে কেটে উঠার জন্য ওই মাসে তার চারটি স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন পড়লো। সে তার প্রতিবেশী তরীকে বলল, 'এক মাসের জন্য ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ধার দেওয়া যাবে? ব্যবসাপাতি নিয়ে খুব সমস্যায় আছি।'

জীবনের সমস্যা শুনে তরী সাহায্য করতে রাজি হল।

এক্ষেত্রে তিন প্রকার লেনদেন ঘটতে পারে।

কেস ০১ : সুদমুক্ত ঋণ

তরী চাইলে জীবনকে বিনা সুদে ঋণ দিতে পারে। অর্থাৎ, ঋণ দেবার পরে তরী বলবে, 'যেই ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিয়েছ শুধু সেই ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দিলেই চলবে।'

এভাবে জীবন যদি ঋণ নেয় এবং মাস শেষে ঋণ ফেরত দেয়, জীবন ও তরীর মাঝে মোট মুদ্রায় কোনো পরিবর্তন আসবে কি?

না, আসবে না। দুজনের কাছেই মাস-শেষে সমান সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা থাকবে।

একই শর্তে যদি প্রতি মাসে একবার করে ১ বছরে মোট ১২ বার জীবন, তরীর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করে দেয়? তাহলেও বছর শেষে তাদের মোট মুদ্রার সংখ্যার কোনো পরিবর্তন আসবে না, সম্পূর্ণ একই থাকবে।

আচ্ছা, ব্যবসায়ী জীবন ও তরী যদি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করতো তাহলে কী হতো?

কেস ০২ : অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা

এবারে ঋণ নেয়ার কথা তুলতেই তরী জীবনকে বলল, 'ঋণ তো ব্যবসার জন্য প্রয়োজন। ভাই আসেন আমরা একসাথে ব্যবসা করি। আপনিও লাভ নেন, আমিও লাভ নেই। আবার লোকসান হলে দুজনেরই হোক।'

তরীর কথা শুনে জীবন প্রস্তাবটিতে রাজি হয়ে গেল।

রফা হল, জীবন দিবে ৪টি স্বর্ণমুদ্রা এবং তরী দিবে ৪টি স্বর্ণমুদ্রা। এই ৮টি স্বর্ণমুদ্রা তারা একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে এবং বছর শেষে প্রকল্পটি গুটিয়ে ফেলা হবে। লাভ যা হবে সেটার অর্ধেক নিবে তরী, অর্ধেক নিবে জীবন। লোকসান হলেও তার ভার দুজনে সমানে সমানে বহন করবে।

ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি উভয়টা হওয়াই স্বাভাবিক। ধরা যাক, সবকিছু ঠিক থাকলে ৫০% সময় লাভ হবে এবং ৫০% সময় ক্ষতি হবে; তাহলে, ১২ মাসের মধ্যে লাভ হবে ৬ মাস এবং ক্ষতি হবে ৬ মাস।

যেই মাসে ব্যবসায় লাভ হয় সেই মাসে জীবনের হাতে আসে ধরি ২টি স্বর্ণমুদ্রা, আর যেই মাসে ব্যবসায় ক্ষতি হয় সেই মাসে তার হাত ছাড়া হয়ে যায় ২টি স্বর্ণমুদ্রা।

৫০% সময় ক্ষতি হওয়ায় ৬ মাসে মোট ক্ষতি হবে ১২টি স্বর্ণমুদ্রা

৫০% সময় লাভ হওয়ায় ৬ মাসে মোট লাভ হবে ১২টি স্বর্ণমুদ্রা

বছর শেষে প্রকল্প গুটিয়ে নিলে তরী ফেরত পাবে ৪টি স্বর্ণমুদ্রা এবং জীবন পাবে ৪টি স্বর্ণমুদ্রা। অর্থাৎ, দুজনের কাছেই ১০০টি স্বর্ণমুদ্রা রয়ে যাবে।

কেস ০৩ : সুদে ঋণ

এই কেসে ধরে নেই, জীবন ঋণ নেয়ার কথা তুলতেই তরী শর্ত জুড়ে দিল, '৪টি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিলে ফেরত দিতে হবে ৬টি স্বর্ণমুদ্রা।' বিকল্প ব্যবস্থা না পেয়ে জীবন এই শর্তে ঋণ নিতে রাজি হয়ে গেল এবং মাস শেষে ঋণ পরিশোধ করলো। জীবন ও তরীর মোট মুদ্রার কি কোনো পরিবর্তন এসেছে?

হ্যাঁ, এবার এসেছে। জীবনের কাছে মাস-শেষে ৯৮টি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে আর তরীর কাছে আছে ১০২টি স্বর্ণমুদ্রা।

এভাবে যদি একই শর্তে ১২ বার (পুরো বছর) জীবন ঋণ নেয় ও সময়মত ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে বছর শেষে তাদের মোট সম্পদের কি পরিবর্তন আসবে? হ্যাঁ, বছর শেষে জীবনের কাছে থাকবে ৭৬টি স্বর্ণমুদ্রা এবং তরীর কাছে থাকবে ১২৪টি স্বর্ণমুদ্রা। খুব সংক্ষেপে ও সরল অর্থে রূপসাগরের সমাজে এই প্রথম অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূচনা হলো।

খেয়াল করুন, উপরের কাঠামোতে ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতি, চুরি-ডাকাতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, অসুখ, মৃত্যুসহ বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারতো। কিন্তু এখানে কিছুই ঘটেনি, কারণ, আমরা ধরে নিয়েছি এমন কিছুই

ঘটবে না। তার মানে, অন্য কোনো কিছুর প্রভাব ছাড়াই শুধুমাত্র সুদের কারণে একটি সমাজে নিশ্চিতভাবে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে।

নিশ্চয়ই ব্যবসায় সফলতা ধরে রাখতে পারলে (৫০% এর অধিক সময় লাভ করলে) একজন ব্যক্তির পক্ষে অপরাপর সদস্যদের তুলনায় সম্পদশালী হওয়া সম্ভব (আবার বিফল হলে সব হারানো সম্ভব)। তাছাড়া অসুখ-বিসুখ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণেও ধনী দরিদ্রের পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। তবে এগুলো যেহেতু অনিশ্চিত বিষয়, যেকোনো দিকে আসতে পারে। সেজন্য আমরা এদেরকে বৈষম্য বলতে পারি না। সেই তুলনায় সুদে অর্থনৈতিক পার্থক্য হওয়া নিশ্চিত এবং তা একপেশে।

এভাবে আমাদের প্রাথমিক কিন্তু খুব কার্যকর এই চিন্তার কাঠামো 'রূপসাগর' থেকে দেখলাম, কিভাবে 'সুদ' নিশ্চিত রূপে বৈষম্য তৈরি করছে। এই পৃথিবীকে দ্বীপ এবং এক একটি রাষ্ট্রকে এক একটি পরিবার হিসেবে কল্পনা করলেও আপনি একই ফলাফলে পৌছাতেন। উপরের উদাহরণে কেবল মাত্র চিন্তার স্বচ্ছতা এবং ভাষার সরলতার স্বার্থেই রূপসাগরের উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে।

চিন্তার খোরাক

- একটি সমাজে সুদের আর কি কি বৈষম্যমূলক প্রভাব রয়েছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিনে দিনে রূপসাগরের শিশুরা বড় হয়ে নতুন নতুন পরিবার গঠন করেছে, তাদের সন্তানরাও একদিন বড় হয়েছে, বিয়ে করেছে। এভাবে দেশটির জনসংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে। পাশাপাশি পারস্পরিক লেনদেন, অসুখ-বিসুখ, দুর্যোগ ইত্যাদির প্রভাবে সবার হাতে এখন আর সমান সংখ্যক মুদ্রা নেই। কারো হাতে কম এবং কারো হাতে বেশি এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুদ্রাগুলো বিস্তৃত আছে। তবে এখন পর্যন্ত এই সমাজটি সম্পূর্ণ সুদমুক্ত আছে (জীবন ও তরী সুদে লেনদেন করেনি এবং তাদের পরেও কেউ তা করেনি)। এমন একটি বৈচিত্রময় সমাজে সুদের সুদীর্ঘ প্রভাব কেমন হবে?

মূল আলোচনায় যাবার আগে একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন কি? আমরা পূর্বের কাঠামোর মোট তিনটি সরলীকরণ বাঁধ তুলে নিয়েছি।

এক. একদা সবার অবস্থা ছিল সমান কিন্তু বর্তমানে সবার অবস্থা সমান নেই। সমাজে কেউ ধনী এবং কেউ দরিদ্র।

দুই. ইতিপূর্বে দ্বীপের জনসংখ্যা ছিল নির্দিষ্ট কিন্তু বর্তমানে দ্বীপের মোট জনসংখ্যা অনির্দিষ্ট এবং সময়ের সাথে তা দ্রুত বর্ধনশীল (মোট জনসংখ্যা যেকোন গ্রহণযোগ্য সংখ্যা হতে পারে)।

তিন. ইতিপূর্বে দ্বীপের অর্থনীতিতে কোনো প্রবৃদ্ধি ছিল না। বর্তমানে সময়ের সাথে অর্থনীতি বড় হয়ে যাচ্ছে।

সবমিলিয়ে রূপসাগরের সমাজ ও অর্থনীতি পূর্বের তুলনায় অনেক বড়, গতিশীল এবং বৈষম্যময়। এবার এমন একটি কাঠামোতে মুদ্রাব্যবস্থার উপর সুদের ফলাফল আলোচনা করা যাক।

রূপসাগরের তরুণ প্রজন্মের একজন কাঠুরের নাম 'রিবা'। প্রতিদিন সকালে সে বনে গিয়ে কাঠ কেটে আনে এবং বিকাল বেলায় সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়। রিবার মতোই আরেকজন কাঠুরের নাম

'মজনু'। তারা দুজনই একে অপরের সতীর্থ। একদিন মজনু ধার হিসেবে রিবার কাছে চারটি স্বর্ণমুদ্রা চাইলে রিবা তাকে ১ মাসের জন্য ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ধার দেয়। কিন্তু তার পরদিন নদীর ধারে কাঠ কাটতে কাটতে রিবা চিন্তা করে দেখলো, এক মণ কাঠ বাজারে বিক্রি করলে সে পায় ২টি স্বর্ণমুদ্রা। এই ২টি মুদ্রাই তাকে তার পরিবারের জন্য খরচ করে ফেলতে হয়। মজনু যদি ৪টি মুদ্রার পরিবর্তে তাকে ৬টি মুদ্রা ফেরত দিত, কি যে ভালো হতো! আর এত কষ্ট করে কাঠ কাটা লাগতো না।

রিবা জানতো এমন বুদ্ধি কাজে দিবে যেহেতু মজনুর জন্য এই ঋণ খুব দরকার ছিল। তাই সে পরবর্তী মাসেই মজনুকে শর্ত দিল, ৪টি মুদ্রা নিলে তার বিপরীতে তাকে ৬টি মুদ্রা ফেরত দিতে হবে, নাহলে আর ঋণ দিবে না। মজনুর আর কী করার, সেই শর্তেই সে ঋণ নিয়ে নিল।

রিবা বুঝলো, এই ফন্দিটা আরো বড় পর্যায়ে খুব কাজে আসবে। তাই সকল জমিজমা বিক্রি করে রিবা মোট ৫০টি মুদ্রা সংগ্রহ করে সেগুলো সুদের ব্যবসায় লাগিয়ে দিল। ঋণের উপরে সুদের হার নিল বছরে ২০% এবং সব সুদ সরল অংকের। সবমিলিয়ে রিবা এক বছরে সুদ পাবে ১০টি স্বর্ণমুদ্রা, পাঁচ বছরে পাবে মোট ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা। সব মিলিয়ে ৫ বছর পরে রিবার হাতে সুদে+আসলে মোট ফেরত আসছে ১০০টি স্বর্ণমুদ্রা। চক্রবৃদ্ধি সুদে আরও বেশি মুদ্রা ফেরত আসতো, তবে রিবা এই লাইনে নতুন দেখে শুধু সরল সুদেই সীমাবদ্ধ রইলো।

এখন পর্যন্ত সবগুলো লেনদেন বেশ ন্যায্য এবং নিরীহ মনে হচ্ছে। রিবা যেহেতু তার কষ্টে অর্জিত মুদ্রা মানুষকে ঋণ হিসেবে ধার দিচ্ছে, এর বিনিময়ে সে কিছু বাড়তি চাইতেই পারে। বর্তমানে ত্যাগ করলে ভবিষ্যতে বেশি পাওয়া যায় এমনটাই তো নিয়ম। রিবার ঋণ সামান্য কিছু বৈষম্য সৃষ্টি করা ব্যতীত সামগ্রিক অর্থনীতির বড় কোনো ক্ষতি করছে বলে মনে হচ্ছে না বরং মনে হচ্ছে সুদের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি তার কষ্টে উপার্জিত টাকার ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে।

এই চিন্তাগুলোর সঠিক উত্তর জানতে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। এই যে নতুন ৫০টি মুদ্রা সুদের কল্যাণে রিবার হাতে আসলো, তা কোথা থেকে এসেছে? দ্বীপে নতুন কোন সোনার খনি আবিষ্কার না হয়ে থাকলে, সেগুলো নিশ্চয়ই অপর কোনো অধিবসীর পকেট থেকে বের হয়ে এসেছে। যারা এই বাড়তি মুদ্রা জোগাড় করে দিলো তারা হয় বাড়তি আয় করেছে অথবা ব্যয় সংকোচন করেছে অথবা নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করে মুদ্রা জোগাড় করে

এনেছে। যেভাবেই ঋণীরা সুদাসল জোগাড় করে আনুক না কেন, একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন, পাঁচ বছরে রিবার মোট মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুন হয়ে গেছে।

মুদ্রা ফেরত পাবার পরে রিবা চাইলে সেগুলো নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে, সঞ্চয় করে রাখতে পারে আবার ঋণ হিসেবে দিয়েও দিতে পারে। রিবা যেহেতু এখন সুদের কারবারি হয়ে গেছে তাই সে হাতে আসা মাত্রই ১০০টি মুদ্রা পুনরায় ৫ বছরের জন্য ঋণ হিসেবে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। ঋণ দিতে সফল হলে রিবার বর্তমান আসল ১০০টি মুদ্রা এবং ২০% সরল সুদে পরবর্তী ৫ বছরে সুদ আসছে ১০০টি মুদ্রা। অর্থাৎ, কোনো গ্রাহক নিঃস্ব বা নিরুদ্দেশ না হয়ে গেলে পরবর্তী পাঁচ বছরে ১০০টি মুদ্রা সুদ এবং ১০০টি মুদ্রা আসল সহ রিবার কাছে মোট ফেরত আসছে ২০০টি মুদ্রা। এভাবে প্রথম ১০ বছরে রিবার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মোট ২০০টি মুদ্রা।

২০০টি মুদ্রা ফেরত আসার পরে রিবা সাহেব নিশ্চয়ই সেগুলো দিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলা করবে না। সুদের ব্যবসা ছেড়ে রিবার যেহেতু খেলোয়াড় হবার খায়েস নেই, মুদ্রাগুলো হাতে আসার পর সে আবারো যত দ্রুত সম্ভব তত তাড়াতাড়ি সব ঋণ দিয়ে দিবে। এই ঋণ সুদে আসলে পরবর্তী পাঁচ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে হবে মোট ৪০০টি মুদ্রায়। এভাবে প্রথম পনের বছরেই ৫০টি মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়ে পরিণত হলো মোট ৪০০টি মুদ্রায়। একেই বলে রমরমা সুদের ব্যবসা।

হয়তো অন্য কোনো ব্যবসা করাটাও সমপরিমাণ লাভজনক হত, কিন্তু টাকার বিনিময়ে পণ্য কিংবা সেবার ব্যবসা করা এবং টাকা দিয়ে টাকার ব্যবসা করা এক বিষয় নয়। আপাত দৃষ্টিতে এই পার্থক্য সামান্যই মনে হতে পারে, অথবা মনে হতে পারে সুদ ব্যবসার মতোই। কিন্তু আমরা আলোচনায় যতই সামনের দিকে আগাবো, ততোই আপনাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে এই পার্থক্য সমাজ ও অর্থনীতিতে কত গভীর এবং শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

লক্ষ্য করুন, রূপসাগরের মোট মুদ্রার ৪০% এখন রিবার নিয়ন্ত্রণে এবং সব মুদ্রা অচিরেই রিবার হাতে চলে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যেহেতু সমাজে মোট মুদ্রার সংখ্যা ১০০০টি দ্বীপের বাদবাকি সবার মালিকানায় আছে মোট ৬০০টি মুদ্রা। আগের মতই ঋণ নবায়ন করতে থাকলে (ঋণ আদায়ের পর পুনরায় ঋণ দেয়াকে ঋণ নবায়ন করা বলে) পরবর্তী ৬ বছরে, অর্থাৎ,

ঋণ ব্যবসা শুরু করার মাত্র ২১ বছরের মাথায় রিবার মালিকানায় থাকবে ৯৬০টি মুদ্রা এবং বাদ বাকি সব অধিবাসীর মালিকানায় থাকবে কেবল ৪০টি মুদ্রা। অর্থাৎ, মাত্র ২১ বছরের মধ্যেই রূপসাগরের প্রায় সব মুদ্রা রিবার হাতে চলে আসছে।

এই ভয়ংকর ফলাফল দেখে আপনি অবাক হতে পারেন কিংবা চিন্তা করে বলতে পারেন 'একটি জাতি কতটা ঋণ নিতে পারে? ২০তম বছরে রিবার মালিকানায় যখন ছিল ৮০০টি মুদ্রা, বাদ বাকি সব অধিবাসীর মালিকানায় তখন ছিল ২০০টি মুদ্রা। এটা কি করে সম্ভব যে মাত্র ২০০টি মুদ্রার অধিপতিরা ৮০০টি মুদ্রা ঋণ নিবে?'

বিষয়টি সম্ভব কিনা সেই আলোচনায় না গিয়ে এই দাবিটা সত্য বলে ধরে নেই যে, 'এত বেশি পরিমাণ ঋণ নেয়া একেবারেই অসম্ভব। অধিবাসীরা সর্বোচ্চ ১০০টি মুদ্রার ঋণ নিবে। অর্থাৎ, রিবার ৫০টি মুদ্রা সুদে আসলে বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ১০০টি মুদ্রাতে পৌঁছালেই 'হার্ড ব্রেক'। ঋণের পরিমাণ আর বৃদ্ধি করা যাবে না। পুরানো ঋণ নবায়ন করে করেই রিবাকে জীবন পার করে দিতে হবে।' কিন্তু তারপরেও একই ফলাফল ঘটবে।

হিসাব

- চিন্তা করে দেখুন, ২০% সরল সুদে ১০০টি মুদ্রা ঋণ দিলে প্রতি বছর সুদ আসছে মোট ২০টি মুদ্রা। এখন এই নতুন ২০টি মুদ্রা যেহেতু ঋণ দেওয়া সম্ভব না, রিবা এগুলোকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এভাবে প্রতি বছর ২০টি মুদ্রা জমা করতে থাকলে মোট ৪৫ বছরে জনাব রিবার সঞ্চয়ে জমা পড়বে ৯০০টি মুদ্রা। অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতেও সব কটি মুদ্রা ৪৫ বছরে রিবার হয়ে যাচ্ছে (৪৫×২০+১০০=১,০০০)। এমনকি রিবা যদি ১০০ মুদ্রা ঋণ না দিয়ে প্রতি বছর কেবল শুরুর ৫০টি মুদ্রা ঋণ নবায়ন করতে থাকতো, সেক্ষেত্রেও মোট ৯৫ বছরে রিবা পরিবার হয়ে যেত দ্বীপের সব কটি মুদ্রার মালিক! (৯৫×১০+৫০=১,০০০)

দ্বিতীয় যেই অভিযোগটি উত্থাপিত হতে পারে তা হচ্ছে, 'সকল মুদ্রা সঞ্চয় করে ফেলা কোনো বাস্তবসম্মত চিন্তা নয়'।

একজন মানুষকে তার নিজের এবং নিজ পরিবারের ভরণপোষণ বাবদ অর্থকড়ি ব্যয় করতে হয়। সুদের কারবারিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই রিবা ২০টি মুদ্রা সম্পূর্ণ সঞ্চয় না করে এর থেকে কিছু অংশ নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করবে সেটাই স্বাভাবিক।'

এই কথাটি সঠিক। তাই আমরা ধরে নেই, রিবা প্রতি বছর ১০টি মুদ্রা নিজের জন্য ব্যয় করে বাদবাকি ১০টি মুদ্রা সঞ্চয় করে রাখে। খেয়াল করুন, এরপরেও সব মুদ্রা জনাব রিবা পরিবারের হাতে চলে যাবে। এমনকি যদি রিবা আরও কিছু বেশি মুদ্রা নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করত এবং আরও কম ঋণ নবায়ন করত, তাতেও সব মুদ্রা রিবার পরিবারের হাতেই কেন্দ্রীভূত হতো!

একটু চিন্তা করলে তৃতীয় আরেকটি অভিযোগ সামনে আসতে পারে। অনেকে বলতে পারেন যে, একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক ঋণ গ্রহণ করে না। ঠিক তেমনি, রূপসাগরের সকল সদস্যও ঋণ গ্রহণ করবে না। অল্প যে কয়জন ব্যক্তি ঋণ নিবেন কেবল তারাই তাদের মুদ্রা হারাবেন। যারা রিবার থেকে কখনও ঋণ গ্রহণ করবে না তারা কিছুই হারাবে না। অর্থাৎ, সুদের চক্রে সবার মুদ্রা একজন সুদ কারবারির হাতে কুক্ষিগত হবার সম্ভাবনা নেই! উপরে বর্ণিত ফলাফল কেবলই একটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা!!

প্রকৃতপক্ষে, একটি সমাজের সব সদস্যকে যে ঋণের আওতায় নিয়ে আনতে হবে ব্যাপারটি এমন না। কেবলমাত্র একজন সফল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (যেমন-সরকার) যদি ঋণের বোঝা বহন করতে থাকে, তাহলেও এই উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। কারণ, কত জন ঋণ নিচ্ছে বা কে নিচ্ছে তা মূখ্য বিষয় নয়। যেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গই সুদ পরিশোধ করতে থাকুক না কেন, ফলাফল একদম একই রকম হবে।

টিকা- তোতা মিয়া

আমাদের অনেকেরই এটা মেনে নিতে খুব কষ্ট হয় যে সুদের চক্রে সব মুদ্রা একজন ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হবে। একটিবার ভেবে দেখুন তো, রূপসাগরের কৃষক তোতা মিয়া যদি তার আমবাগান ১ বছরের জন্যে কাউকে সুদে ইজারা দিতো তাহলে কি হতো?

সুদে ইজারার শর্ত অনুযায়ী যে বাগান ইজারা নিতো সে বাগানের সব আম ভোগ করতো কিন্তু এর বিনিময়ে তোতা মিয়া এক টাকাও নিতো না। তোতা মিয়া বাগান ভাড়ার সম-মূল্যের ছোট এক টুকরা জমি কেবল ফেরত চাইতো। এভাবে তোতা মিয়ার জমির পরিমাণ বেড়ে যেত। পরের বছর সে নতুন পুরাতন সব জমি ইজারা দিয়ে আরও বেশি পরিমাণ জমি ফেরত নিতো। এভাবে সে আরও বেশি বাগানের মালিক হতো। এমন করে চলতে চলতে একসময় তোতা মিয়া রূপসাগরের সব বাগানের মালিক হয়ে যেত।

সুদ কারবারিরাও ঠিক তেমনি করে সুদের চক্রে টাকা দিয়ে সব টাকা কিংবা মোহর দিয়ে সব মোহরের মালিক হয়ে যাবে। সুদ চর্চা আদতে যেকোনো বস্তু দিয়েই করা সম্ভব। শর্ত হচ্ছে, আপনি যা দিবেন সেই একই বস্তু তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ফেরত নিবেন। একারণেই সুদ দিয়ে যেকোনো বস্তু দখল করা সম্ভব।

ব্যবসা

সুদের দ্বারা কিভাবে একটি অর্থনীতির সব মুদ্রা কুক্ষিগত করা সম্ভব তা আপনারা দেখছেন। কিন্তু ব্যবসা করে কী সব মুদ্রা কুক্ষিগত করা সম্ভব? সম্ভব হলে তা কিভাবে সম্ভব হতো এবং সম্ভব না হলে তা কেন সম্ভব হতো না?

আসুন, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে আমরা আবারো রূপসাগরে ডুব দেই।

প্রখ্যাত ব্যবসায়ী বুলবুল সাহেব ফন্দি আঁটলেন ব্যবসা করেই তিনি সব মুদ্রা কব্জাগত করবেন। সেই পরিকল্পনা মাফিক বুলবুল সাহেব ৫০টি মুদ্রা পুঁজি দিয়ে সাগরের পাড়ে একটি বাড়ি নির্মাণ করলেন এবং নির্মাণ কাজ শেষে চমৎকার বাড়িটি তার প্রতিবেশী ময়নার কাছে ভাড়া দিয়ে দিলেন। বাড়ির ভাড়া হচ্ছে বরাবর রিবার সুদের হারের সমান, বছরে ২০% বা ১০টি মুদ্রা। দেখা যাক, বুলবুল সাহেবের মহাপরিকল্পনা কতটা সফল হয়।

ভাড়া হাতে পাবার পর বুলবুল সাহেব যদি নিজ প্রয়োজনে সব মুদ্রা ব্যয় করে ফেলেন, মুদ্রার মালিকানা তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। আবার তিনি যদি মুদ্রাগুলো দিয়ে নতুন বিনিয়োগ করে ফেলেন তাতেও মুদ্রার মালিকানা হাতছাড়া হয়ে যাবে। প্রথম কয়েক বছর এমন করে বুলবুল সাহেবের এই আক্কেল হলো। তাই তিনি মুদ্রা জমানোর মাস্টার প্ল্যান করলেন। এখন থেকে তিনি কোনো বিনিয়োগ করবেন না এবং সঞ্চয় ভেঙে ব্যয়ও করবেন না। বাড়ি ভাড়া থেকে অর্জিত সব মুদ্রা সিন্দুকে তালা মেরে রাখবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন যক্ষের ধনের মত মুদ্রা ধরে রাখার কৌশল অবলম্বন করে বুলবুল সাহেব কি সব মুদ্রা নিজ হস্তগত করতে পারবেন?

খেয়াল করুন, প্রতি বছর বাড়ি ভাড়া বাবদ ১০টি মুদ্রা জমা করলে বিশ বছর বাদে বুলবুল সাহেবের সংগ্রহে থাকবে সর্বোচ্চ ২০০টি মুদ্রা (২০ × ১০) কিন্তু সুদ কারবারির সংগ্রহে থাকবে ৮০০টি মুদ্রা। সুদ কারবারির তুলনায় ব্যবসায়ীর সংগ্রহ এতো কম কেন?

কম হবার কারণ হল সিন্দুকে বসে মুদ্রা ডিম পাড়ে না। তাই কেউ সিন্দুকে ফেলে রাখলে মুদ্রা কেবল ধুলা ময়লা উপহার দেয়। অপরপক্ষে সুদ কারবারি ঋণ দিলে মুদ্রাগুলো নতুন মুদ্রা জন্ম দেয়। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল এই ব্যাপারটি বুঝে বলেছেন :

> *'Money was intended to be used in exchange, but not to increase at interest. And this term interest, which means the birth of money from money, is applied to the breeding of money because the offspring resembles the parent. Wherefore of all modes of getting wealth this is the most unnatural.'*[১]
>
> *'মুদ্রার উদ্দেশ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা, সুদে বেড়ে যাওয়া নয়। সুদ মানে টাকা নিজেই আরেকটা টাকার জন্ম দিচ্ছে এবং নতুন জন্ম নেয়া টাকাটা অবিকল জন্মদাতা টাকার মত। পৃথিবীতে সম্পদ বৃদ্ধির যতগুলো উপায় আছে, তাদের মধ্যে এটিই সবচেয়ে অ-প্রাকৃতিক।'*
>
> *– এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব)*

আচ্ছা, বুলবুল সাহেব যদি মুদ্রাগুলো বিনিয়োগ করতেন তাহলে কি হতো? তাহলে সম্পদ বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু তিনি তা করেননি। মুদ্রা ধরে রাখতে চান বলে পুনরায় বিনিয়োগ করতে তিনি অনিচ্ছুক, আবার নৈতিক কারণে রিবার পথে হাঁটতেও তিনি অনিচ্ছুক। তার মহাপরিকল্পনা হচ্ছে সব মুদ্রা নিজ হাতে কুক্ষিগত করে দ্বীপের মুদ্রাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিবেন এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনে কিছুদিন কষ্ট করতে হলে করবেন।

একজন সুচিন্তিত পাঠক ভাবতে পারেন, একদিন না একদিন তো সব মুদ্রা বুলবুল সাহেবের হাতে আসবেই। যেভাবে সুদ কারবারির সব মুদ্রা অর্জন করেছিল, ঠিক তেমনি করে একটু ধৈর্য ধারণ করলে, বুলবুল সাহেবও সব মুদ্রা অর্জনে সফল হবেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই সফলতার সম্ভাবনা শূন্য। সিন্দুকে মুদ্রা জমা পড়তে থাকলে বাজারে মুদ্রার সংখ্যা (money in circulation) কমে আসবে। তখন সবার হাতে হাতে আর আগের মত টাকা-পয়সা থাকবে না। সবার হাতে টাকা কমে গেলে অর্থনীতিতে মূল্যহ্রাস বা ডিফ্লেশন দেখা দিবে অর্থাৎ, সবকিছুর দাম কমে যাবে, এমনকি বাড়ি ভাড়াও কমে যাবে। তখন ভাড়াটিয়া

১ সূত্র : http://la.utexas.edu/users/hcleaver/368/368AristotlePolitics.html

ময়না এসে বলবে, 'বুলবুল সাহেব, বাড়ি ভাড়া কমান, অথবা অন্য কোথাও চলে যাব।'

তিনি রাজি না হলে ময়না চলে যাবে এবং খালি বাড়ি আগের দামে ভাড়া দিতে চাইলে নতুন প্রার্থী টুনটুনি বলবে, 'এখন তো সব কিছুর দাম কমে গেছে। আপনি এত ভাড়া রাখছেন কেন? ভাড়া কমাতে পারলে এই বাড়ি নিব, অন্যথায় অন্য কোন বাড়ি দেখব।' অর্থাৎ, নিরূপায় হয়েই বুলবুল সাহেব বাড়ির ভাড়া কমাবেন। এর পরেও মুদ্রা সিন্দুকে ভরে রাখলে দিন যতই যাবে, সবকিছুর দাম আরও কমে যাবে। একসময় টুনটুনিও এসে বলবে, 'বুলবুল সাহেব, বাড়ি ভাড়া কমান, অথবা অন্য কোথাও চলে যাব।'

এভাবে ক্রমান্বয়ে ভাড়া কমাতে থাকলে ২০ বছরে ২০০টি মুদ্রা সংগ্রহ করাই অসম্ভব হয়ে যাবে। আর মানুষ যেহেতু মুদ্রা ছাড়া চলতে পারে না সব কটি মুদ্রা বুলবুল সাহেবের দ্বারা সংগ্রহ করা গাণিতিক ভাবেই অসম্ভব।[২]

তাহলে সুদের কারবারি কিভাবে পারলো? যেভাবে একজন ব্যবসায়ীর দ্বারা মুদ্রা কুক্ষিগত করার স্বপ্ন হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়, সেই রকম

---

২ একটি ধর্মীয়শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই উদাহরণে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বুলবুল সাহেব সিন্দুকের কোন মুদ্রা দান করবেন না এবং ধারও দেবেন না। কেবলমাত্র সঞ্চয় করে যাবেন। এভাবে সঞ্চয় করাতে মুদ্রাপ্রবাহ কমে গিয়ে ওনার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দ্বিতীয়ত, এভাবে মুদ্রা কুক্ষিগত করে রাখাতে দ্বীপের অধিবাসীদেরও মুদ্রা সংকটে পড়তে হবে। তিনি যদি সঞ্চিত মুদ্রা বিনা সুদেও ঋণ দিতেন, অর্থনীতিতে মুদ্রাপ্রবাহ বজায় থাকত, দ্বীপে মুদ্রা সংকট সৃষ্টি হতো না এবং বাড়ির ভাড়া কমাতে তিনি বাধ্য হতেন না। প্রকৃতপক্ষে, ধার দেওয়া হতো তাঁর নিজের আয় রোজকারের জন্যই উত্তম। তার পাশাপাশি অধিবাসীদের জন্যও স্বস্তিকর। ইসলাম ধর্মেও ধার দেওয়াকে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কুরআনে উল্লেখ আছে– "কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? ফলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহতায়ালাই রিজিক সংকুচিত করেন ও বৃদ্ধি করেন। তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" (সুরা বাকারা: ২৪৫)
তবে একটি সমস্যা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে ধার দিতে থাকলে সবাই বুলবুল সাহেবের কাছে ঋণী হয়ে পড়ত। এর একটি সমাধান হচ্ছে জাকাত এবং অনুদান। স্বেচ্ছায় দান করা হচ্ছে অনুদান। অপরপক্ষে, জাকাত হচ্ছে বাধ্যতামূলক দান। জাকাত ব্যবস্থায় সব মুসলিম নর-নারীকে সঞ্চিত তরল সম্পত্তির, যেমন মুদ্রা, গবাদিপশু ইত্যাদির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ প্রতি বছর দান করতে হয়। এই ব্যবস্থায় বুলবুল সাহেব মোট ৪০০ মুদ্রা ঋণ জমানোর পরে বার্ষিক জাকাত আসত ১০ মুদ্রা, যা বাড়ি ভাড়ারই সমান। অর্থাৎ, জাকাত থাকলে ৪০০ মুদ্রার চেয়ে বেশি সঞ্চয় করা হতো গাণিতিকভাবেই অসম্ভব। 'তাদের অর্থাৎ ধনীদের ধন-সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে'। (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৯)

করে সুদ কারবারির দ্বারা সব মুদ্রা সংগ্রহ করার স্বপ্ন তার হাতের নাগালের বাইরে চলে যায় না কেন?

যায় না কারণ ঋণ দিলে মুদ্রা কুক্ষিগত থাকে না। মুদ্রা হাত বদলায়, মালিকানা বদলায় না। তাই সুদের চক্রে মুদ্রা কুক্ষিগত করতে থাকলে মুদ্রা প্রবাহে সংকট সৃষ্টি হবে না। রিবা যখন ঋণ দিবে তখন পুনরায় মুদ্রাগুলো বাজারে প্রবেশ করবে। এভাবে সোনার মোহর কেবল রিবার সিন্দুকে বসে থাকবে না, সবার হাতে হাতে ঘুরে বেড়াবে। তাই মুদ্রা সংকট কিংবা মুল্যহ্রাস কোনোটাই হওয়ার ভয় নেই।

আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে যে সিন্দুকে সব মোহর জমা করে রাখায় যেমন করে বুলবুল সাহেব বাড়ি ভাড়া কমাতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনি করে সব মোহর জমা করতে থাকলে সুদ কারবারিও কি সুদের হার কমাতে বাধ্য হবেন?

সুদ কারবারি সিন্দুকে মুদ্রা জমা করতে থাকলে দ্বীপে মুদ্রা সংকট বৃদ্ধি পেয়ে সুদের আরো উপকার হবে। কারণ, মানুষের হাতে মুদ্রা যখন কমে যায়, সবাই মুদ্রা পাবার জন্য মরিয়া হয়ে যায়। এর ফলে পূর্বে যারা ঋণের আওতার বাইরে ছিল তারাও মুদ্রাশূন্য হয়ে ঋণ নিতে মহাজনের কাছে ভিড় করে। এক্ষেত্রে সুদের হার কমা তো দূরে থাক বরং আরও বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রা সংকট হলো সুদ কারবারির সোনার হরিণ কারণ বাজারে মুদ্রা যতো কমে, সুদের চাহিদা তত বাড়ে। এভাবে মুদ্রাসংকট সৃষ্টি করে ঋণের পরিধি ধীরে ধীরে বড় থেকে বড় করা যায় দেখে একটি অর্থনীতিতে ঋণ নেওয়ার সর্বোচ্চ কোনো সীমা নেই।

পূর্বে যে তর্কের খাতিরে ধরে নিয়েছিলাম কেবল মাত্র ১০০টি মোহর ঋণ দেবার পর রিবা বাড়তি ঋণ প্রদান করতে পারবে না তা সঠিক ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়

বর্তমান বিশ্বের অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা রূপসাগরের তুলনায় অনেক জটিল। এখন প্রতিটি রাষ্ট্রের অর্থনীতিই সময়ের সাথে বড় হচ্ছে, বছর বছর নতুন নতুন প্রযুক্তি যুক্ত হচ্ছে। সেই হিসেবে আমরা কি উপরে বর্ণিত ফলাফল আমাদের জীবনে সংঘটিত হওয়ার আশংকা করতে পারি?

খেয়াল করুন, রূপসাগরের অর্থনীতির আকৃতিও সময়ের সাথে বড় হচ্ছে, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু অর্থনীতির আকৃতি সময়ের সাথে যত বড়ই হতে থাকুক না কেন, কিছু যায় আসে না। রূপসাগরের অর্থনীতি ২১ বছরে যদি ২১ গুণ বড়ও হত, সকল মুদ্রা রিবার হাতেই আসতো। কারণ সুদ হচ্ছে মুদ্রা কেন্দ্রিক লেনদেন। মুদ্রার পরিমাণ যদি সমান থাকে সুদের চক্রে সব মুদ্রা রিবার হাতে আসবেই। রিবা যদি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না পারতো তাতেও ফলাফল কোনোরকম পরিবর্তিত হতো না।

আচ্ছা, বর্তমান যুগেতো আমরা স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করি না এবং আধুনিক বিশ্বে মুদ্রার সংখ্যা রূপসাগরের ন্যায় স্থির না। সময়ের সাথে মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে আমরা উপরে বর্ণিত ফলাফলে পৌঁছুব না। তাই না?

এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে এমন একটি কাঠামোর প্রয়োজন যেখানে বছর বছর মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, রূপসাগরের অধিবাসীরা যদি মুদ্রা হিসেবে কড়ি ব্যবহার করতেন এবং প্রতি বছর সাগর থেকে নতুন নতুন কড়ি ভেসে আসতো তাহলে আমরা সুদের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে উপরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম। তাই, আধুনিকতার সুরের সাথে তাল মিলিয়ে, আমরাও মনে করি –

'রূপসাগরের অধিবাসী আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রথম প্রজন্মের জীবন ও তরীর পরে বুলবুল সাহেবদের ছেলেমেয়েরাও এখন বড় হয়ে গিয়েছে। অর্থনীতির আকৃতি বড় হওয়ায় এবং মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সবাই মিলে ঠিক করলো এখন থেকে সাগর পাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া

কড়ি দিয়েই তারা লেনদেন করাবে এবং সৈকতে ভেসে আসা নতুন কড়িগুলো যে কুড়িয়ে পাবে সেগুলো তার বলে বিবেচ্য হবে।'

আপনি কি ভাবছেন, সাগর থেকে ভেসে আসা কড়ি কিভাবে সোনাকে প্রতিস্থাপন করবে? একথা জেনে খুশি হবেন যে, আপনি একা নন, আমরা সবাই কম-বেশি এমন প্রশ্ন করে থাকি। কারণ, আমরা অনেকেই জানি না যে টাকার মূল্য নির্ধারিত হয় কিভাবে? কবির ভাষায়, 'টাকার মূল্যমান সৃষ্টির রহস্য কি?'

(প্রিয় পাঠক, আপনাকে বলছি, চাইলে কড়ির জায়গাতে সোনার মোহর এবং সাগর তীরের জায়গায় নতুন নতুন সোনার খনি উল্লেখ করে বিশ্লেষণ চালিয়ে যাওয়া যেত। সেক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ একই ফলাফল আসতো। কেবলমাত্র বর্ণনার বৈচিত্র্য এবং নতুন নতুন মুদ্রার সাথে আপনাদের পরিচিত করানোর স্বার্থেই কড়ির উদাহরণ টেনে আনা হল।)

টাকা

টাকা (বা মুদ্রা) হচ্ছে এমন একটি জিনিস যার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। টাকার মূল্যমান সৃষ্টি হয় এর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাপেক্ষে। সোজা বাংলায়, কোনো অঞ্চলের মানুষের মন যেটাকে মূল্যবান ভাববে সেটাই মূল্যবান, যেটাকে মূল্যহীন ভাববে, সেটাই মূল্যহীন! আর সেকারণেই টাকা একই সাথে মহামূল্যবান, আবার মূল্যহীনও হতে পারে। মনে করুন, বিমান দুর্ঘটনায় আপনি এক দুর্গম আদিবাসী পল্লীতে গিয়ে পতিত হলেন। সেই যাত্রায় আপনি জানে বেঁচে গেলেন এবং সাথের কিছু মালামাল ও টাকা পয়সাও অক্ষত রয়ে গেল। সুস্থ হবার পরে বাজারে খাবার কিনতে গিয়ে দেখলেন সবাই ছাগলের শিং দিয়ে লেনদেন করছে। কেউ ব্যাংক নোট ছুঁয়েও দেখছে না। তখন আপনি কি করবেন?

আপনার সাথের মালামাল বিক্রি করে অথবা চাকরি খুঁজে শ্রমের বিনিময়ে কতক ছাগলের শিং অর্জন করে খাবার কিনবেন। লক্ষ্য করুন, এমন একটি বিচ্ছিন্ন পল্লিতে আপনি সব কিছু বিক্রি করে ছাগলের শিং অর্জন করতে পারবেন। একমাত্র কাগুজে মুদ্রা ছাড়া। কারণ, সেই সমাজে আপনার টাকার কোনো মূল্য নেই।

আবার, আপনি যখন আদিবাসী পল্লী থেকে নিজ শহরে কিছু ছাগলের শিং হাতে ফিরে আসবেন, কেউ তা ছুঁয়েও দেখবে না। কারণ এই সমাজে

ছাগলের শিং-এর কোনো মূল্য নেই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এভাবেই আপনার ছাগলের শিং ও টাকা (মুদ্রা) মূল্য হারিয়ে ফেলল বা ফিরে পেল।

টাকার যে স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নাই এই বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার জন্য কল্পনা করুন– আপনি এমনই একটি নির্জন দ্বীপে পতিত হলেন যেখানে কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই। সেখানে আপনার টাকা-পয়সা কিংবা সোনার মোহর কি কোনো উপকারে আসবে? নিশ্চয়ই না। উপকারে না আসার কারণ হচ্ছে এগুলোর নিজস্ব কোনো ব্যবহার নেই। অপ্রয়োজনীয় বস্তু। আর অপ্রয়োজনীয় বস্তুর কোনো মূল্যও নেই।

প্রকৃতপক্ষে এমন অনেক অপ্রয়োজনীয় বস্তু আছে যা দ্বারা মুদ্রা তৈরি হতে পারে। বাংলা অঞ্চলে মুদ্রা হিসেবে কড়ির প্রচলন ছিল যা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বস্তু। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ অঞ্চলে পাখির পালককে তারা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতেন। এছাড়া সোনা, রূপা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রার বিস্তীর্ণ ব্যবহার ছিল ইতিহাস জুড়ে। কড়ি বা পাখির পালকের মতো সোনা এবং রূপাও এক অর্থে 'প্রায়' অপ্রয়োজনীয় বস্তু। বাস্তবতা বিচার করলে, কিছু শিল্প কারখানা ছাড়া আমরা সোনা ও রূপাকে কেবল অলংকার হিসেবেই ব্যবহার করে থাকি। আমরা যদি মূল্য না দিতে মনস্থ করি, সোনার টুকরাও ধূলিকণার মতো রাস্তার ধারে পড়ে থাকবে। কারণ সোনা এমন কিছু না যা ছাড়া আমরা চলতে পারি না। সেই তুলনায় খাবার, পানি, লবণ, লোহা, তামা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। এগুলো ছাড়া হয় আমরা একেবারেই চলতে পারি না অথবা আমাদের চলা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। তবে মুদ্রা যে কেবল অপ্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে তৈরি হতে হবে এমন শর্তও নেই। প্রয়োজনীয় বস্তু, যেমন– লবণ, ধান, খেজুর, তামা ইত্যাদিকেও মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করার প্রচলন ইতিহাস জুড়ে আমরা দেখতে পারি।

তাহলে টাকার মূল্যমান আসে কোথা থেকে?

মুদ্রার মূল্যমান নির্ভর করে মুদ্রার মোট পরিমাণ এবং এর গতির উপর (অর্থাৎ, একটি অর্থনীতিতে কত দ্রুত টাকা হাত বদল করছে তার উপর)। সাধারণত টাকার গতি খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়, এজন্য আমরা বলতে পারি টাকার পরিমাণ যত দ্রুত বৃদ্ধি পাবে মূল্যস্ফীতিও সমান তালে বৃদ্ধি পাবে।

বিষয়টি সহজভাবে বোঝা যায় এভাবে, মনে করেন কোনো এক বছর টমেটোর বাম্পার ফলন হয়েছে। বাজারে অনেক বেশি টমেটো থাকায়

স্বভাবতই এর দাম পড়ে যাবে। ঠিক তেমনি, কোনো কারণে যদি সাগর থেকে অনেক বেশি কড়ি ভেসে আসে, কড়ির দামও কমে যাবে। সোনার খনি আবিষ্কার হলে সোনার দাম কমে যাবে। ঠিক তেমনি, টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সব কিছুর দাম বেড়ে যাবে বা টাকার দাম কমে যাবে।

মুদ্রা হিসেবে আমরা যা কিছুই ব্যবহার করি না কেন, তাদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুদ্রাকে হতে হবে পরিমাণে এবং সরবরাহে সীমিত। গাছের পাতা, কিংবা সমুদ্রের ধূলিকণার মতো বিপুল সরবরাহের কোনো বস্তুকে আমরা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। এমনটি যদি করতাম, আমাদেরকে এক বস্তা টাকার বিনিময়ে এক সের চাল কিনতে হতো হয়তো। তখন মুদ্রা তার বহনযোগ্যতার গুণ হারিয়ে ফেলত।

মুদ্রার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সঞ্চয় করে রাখা যায়। পচনশীল দ্রব্যাদি যেমন গাছের পাকা ফল বা সমুদ্রের তাজা মাছ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। এগুলো মুদ্রা হলে আয় করার দুই একদিনের মধ্যেই আমাদেরকে সব ব্যয় করে ফেলতে হতো। সিন্দুকে যত্ন করে সঞ্চয় করে রাখা যেত না। সুতরাং 'মুদ্রা' হিসেবে আমরা সেটাকেই বাছাই করব, যা সহজে নষ্ট হবে না।

এসবের পাশাপাশি মুদ্রাকে হতে হবে সহজে বিভাজনযোগ্য, অর্থাৎ চাইলেই যেন একে ছোট-বড় বিভিন্নভাবে ভাগ করে ফেলা যায় সহজেই। খাদ্যশস্য বা লবণ বিভাজনযোগ্য বলেই এদেরকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আমরা চাইলেই এক ছটাক, আধ ছটাক বা পৌনে এক সের লবণ বিনিময় করতে পারি অর্থাৎ, নিজের প্রয়োজনমাফিক কম-বেশ করতে পারি। এটি হচ্ছে মুদ্রার বিভাজনযোগ্যতা। আমরা কোনো প্রাণী বা গাড়ি বিভাজনযোগ্য নয় বলেই মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। একটি প্রাণীকে দুই ভাগ করলে প্রাণীটি মারা যাবে আবার একটি গাড়িকে তিন টুকরা করলে গাড়িটিও অকেজো হয়ে যাবে। অর্থাৎ, বিভাজন করলে যেই বস্তু তার গুণগত মান হারিয়ে ফেলবে সেই বস্তু মুদ্রা হতে পারবে না।

মুদ্রার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহনযোগ্যতা। অতিরিক্ত ভারি বলেই আমরা সীসাকে কোনোদিন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করিনি। ঠিক একই কারণে আমরা লোহাকেও মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করি না।

সবশেষে, মুদ্রাকে হতে হবে সমতুল্য। দুইটি একই মূল্যমানের মুদ্রাকে গুণে, মানে, আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে একই রকম হতে হবে। যেমন– দুইটি ১ আনার মোহর সব দিক থেকে একই রকম। আবার এক কেজি বিন্নি ধান

সব স্থানে একই রকম। দুটি সমমানের মুদ্রা যদি একই রকম না হতো লেনদেনে সমঝোতায় আসা সম্ভব হতো না। উদাহরণস্বরূপ দুটি গরু বা দুটি কাঁঠাল কখনও সম্পূর্ণ একরকম হয় না। তাই এগুলোর দিয়ে লেনদেন করতে গেলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমঝোতায় পৌঁছাতে পারবে না। একারণে আমরা এগুলোকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না।

মুদ্রার পরিমাণ সীমিত হলেও মুদ্রার একটি গুণ হচ্ছে, আমরা একে পরিমাণে বৃদ্ধি করতে পারি। যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্যের খনি আবিষ্কার করার সাথে সাথে আমরা ধাতব মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারি। আবার যদি মুদ্রা হিসেবে আমরা কড়ি ব্যবহার করি, প্রতি বছরই সাগরের তীর হতে কুড়িয়ে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারি। নতুন মুদ্রা আসার সাথে সাথে যদি অর্থনীতির আকৃতি আগের মতো থাকে, মুদ্রার মূল্যমান আগের তুলনায় কমে যাবে বা মূল্যস্ফীতি দেখা দিবে। আর অর্থনীতির আকৃতি আগের মতো থেকে থাকার পর যদি মুদ্রার পরিমাণ কমে যায় তাহলে মূল্যহ্রাস দেখা দিবে।

কংগ্রাচুলেশনস পাঠক! মুদ্রা কাকে বলে, এর বৈশিষ্ট্য ও আচরণ আপনি চমৎকার শিখে গেলেন। কেউ আমাকে এমন গল্পে গল্পে শেখালে অনার্সের সিজিপিএ-টা হয়তো আরো ভাল হত!

চিন্তার খোরাক

- কাগুজে মুদ্রা কি উপরে বলে আসা মুদ্রার সবগুলো বৈশিষ্ট্য পূরণ করে?

টিকা-টাকা

সময় এবং পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে টাকা যে কিভাবে মূল্য হারাতে পারে তার একটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু বছর পরের জার্মানি। সেই সময় ময়লা আবর্জনার মতো টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া শুরু করে সবাই। এমনকি রাস্তা থেকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে ঝাড়ুদারকে মার্ক (জার্মান মুদ্রা) ডাস্টবিনে ফেলতে দেখা গেছে।

তার কারণ, বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধের ঋণ ও জরিমানা প্রদান করতে গিয়ে জার্মানি বিপুল পরিমাণ মুদ্রা (জার্মান মার্ক) ছাপাতে শুরু করে। এতে এক সময় মার্কের মূল্য এতই কমে যায় যে এক বান্ডেল পুরানো নোটের চেয়ে এক বান্ডেল টয়লেট পেপার আরও মূল্যবান হয়ে উঠে। তাই মানুষ কষ্ট করে

১ম বিশ্বযুদ্ধের কিছু পর জার্মানির মুদ্রা ডাস্টবিনে পড়ে ছিল

বাজার থেকে টয়লেট পেপার না কিনে পুরানো নোট দিয়েই কাজ সেরে ফেলত। কেউ আবার বিরক্ত হয়ে এই মূল্যহীন নোট আবর্জনার মতো ফেলে দেয়। তাই রাস্তাতে আবর্জনার স্তূপের মত মার্ক পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং ঝাড়ু দিয়ে তা পরিষ্কার কর নিতে হয়। এভাবে এককালের মূল্যবান মার্ক সময়ের ব্যবধানে এভাবেই মূল্যহীন হয়ে গেল।

ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ও চক্রবৃদ্ধি সুদ

মুদ্রা কি আপনারা তা খুব সুন্দর করে বুঝলেন। এবারে মূল আলোচনা শুরু করার আগে একটি বিষয় খেয়াল করেছেন কি? আমরা আমাদের কাঠামোটাতে চিন্তার নতুন আরেকটি মাত্রা যুক্ত করেছি? প্রথম অধ্যায়ে জনসংখ্যা ছিল স্থির, অর্থনীতি ছিল স্থবির এবং মুদ্রার সংখ্যা ছিল সীমিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা প্রথম দুটি শর্ত তুলে দিয়েছিলাম। তবে এখন পর্যন্ত মুদ্রার পরিমাণ ছিল স্থির। এবার আমরা সেই লকও খুলে দিচ্ছি, অর্থাৎ, মুদ্রা সংখ্যা হবে পরিবর্তনশীল। তো চলুন, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাব্যবস্থায় সুদের প্রভাব এবং ফলাফল কী তা বুঝে নেই।

এখন থেকে রূপসাগরের মুদ্রা হচ্ছে কড়ি। বর্তমানে সব মিলিয়ে রূপসাগরে মোট ৫,০০০টি কড়ি আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রতি বছর সাগর থেকে ১০০টি নতুন কড়ি ভেসে আসে এবং সবাই যার যার সময় সুযোগ মত সাগরে বেড়াতে গিয়ে কড়িগুলো সংগ্রহ করে আনে। বার্ষিক আয় রোজকারের পাশাপাশি সাগর পাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া কড়িও অধিবাসীদের জীবনে খণ্ডকালীন আয়ের মত কল্যাণ বয়ে আনে।

এমন একটি অর্থনীতিতে এখন পর্যন্ত করা বিশ্লেষণগুলো কতটা কার্যকর? এখন কি সুদ এবং মুদ্রাব্যবস্থা সাম্য বজায় রেখে হাতে হাত ধরে সামনে আগাতে পারবে?

রিবার ছেলে রাজা রূপসাগরে সুদের সেই গদির মালিক। প্রতি বছর রাজা ১,০০০টি কড়ি ঋণ দেয় এবং এই ঋণের বিপরীতে ১০ শতাংশ হারে মোট ১০০টি কড়ি সুদ নেয়। এখন যেহেতু সাগর থেকে বছরে ১০০টি নতুন কড়ি ভেসে আসছে, সব সুদ সিন্দুকে জমা করলে মুদ্রাব্যবস্থায় কোনো সংকট সৃষ্টি হবে না। তবে মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে না, ১,০০০টি কড়িতে স্থির রাখতে হবে। এমনটি করতে পারলে প্রতি বছর রাজার কব্জায় আসা কড়ির সংখ্যা এবং নতুন ভেসে আসা কড়ির সংখ্যা সমান সমান

থাকবে। একারণে, বাজারে মোট ৫,০০০টি কড়ি সর্বদা চলমান থাকবে। তাই সুদ থাকা সত্ত্বেও মুদ্রার ভারসাম্য বজায় থাকবে।[৩]

তবে এই ভারসাম্য বাস্তবসম্মত নয়। এই পদ্ধতিতে সিন্দুকে কড়ির সংখ্যা কেবল বাড়তেই থাকবে এবং রাজার ঘরে অলস কড়ির পাহাড় তৈরি হবে। কোনো 'বিবেকবান' ব্যক্তিই একটি কড়ির পাহাড় বানিয়ে চিরকাল তা অলস ফেলে রাখতে পারে না। আর সুদ ব্যবসায়ীর জন্য তো তা অকল্পনীয়। এক্ষেত্রে বরং তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে :

১. কড়িগুলো পুনরায় ঋণ হিসেবে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে
২. অন্য কোনো ব্যবসাতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে
৩. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করে ফেলা যেতে পারে

আমরা প্রতিটি প্রেক্ষাপটের চিত্রই আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ করব। তারপর মিশ্র কৌশলের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখবো।

১. পুনরায় ঋণ দিলে কি হবে?

সুদের হার দশ শতাংশ হলে ১,০০০টি কড়ি ঋণের বিপরীতে প্রতি বছর সুদ আসে ১০০টি কড়ি। অর্থাৎ, প্রথম বছর শেষে সুদাসল (রাজার পুঁজি) হবে ১,১০০টি কড়ি। দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভে রাজা ঋণ দিতে পারবে ১,১০০টি কড়ি, যার বিপরীতে সুদ আসবে ১১০টি কড়ি।

লক্ষ্য করুন, বছরে ১০০টি কড়ি সাগর থেকে ভেসে আসলে যে সাম্যাবস্থা বজায় থাকতো তা দ্বিতীয় বছরেই ভেঙে যাচ্ছে। সাম্যাবস্থা বলতে বুঝানো হয়েছে, মহাজন সুদ হিসেবে যা নিয়ে নিচ্ছে তার সমান বা অধিক পরিমাণ কড়ি প্রতি বছর সাগর থেকে ভেসে আসছে। কারণ ভেসে আসা কড়ির সংখ্যা যদি কম হয় সব মুদ্রাই সুদ কারবারির পেটে চলে যাবে। এবার দেখুন, দ্বিতীয় বছর শেষে সুদাসল হবে ১,২১০টি কড়ি যার উপর ১০ শতাংশ হারে মোট সুদ আসবে ১২১টি কড়ি। এভাবে তৃতীয় বছর শেষে সুদাসল হবে ১,৩৩১টি কড়ি।

৩ সিন্দুকের ভেতরে পড়ে থাকা ব্যবহারহীন কড়ি এবং সমুদ্রের তলদেশে পড়ে থাকা গুপ্ত মুদ্রা উভয়ই কার্যত মূল্যহীন। তাই অর্থনীতিতে এদের প্রভাব হবে শূন্য।

এবার নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন :

বছর	ঋণ	সুদের হার বছর ১০% অনুযায়ী প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ	সুদ + আসল
১	১০০০	১০০	১১০০
২	১১০০	১১০	১২১০
৩	১২১০	১২১	১৩৩১
৪	১৩৩১	১৩৩.১	১৪৬৪.১
৫	১৪৬৪.১	১৪৬.৪	১৬১০.৫
৬	১৬১০.৫	১৬১	১৭৭১.৫
৭	১৭৭১.৫	১৭৭.১	১৯৪৮.৬
৮	১৯৪৮.৬	১৯৪.৮	২১৪৩.৪
৯	২১৪৩.৪	২১৪.৩	২৩৫৭.৭
১০	২৩৫৭.৭	২৩৫.৭	২৫৯৩.৪
১১	২৫৯৩.৪	২৫৯.৩	২৮৫২.৭
১২	২৮৫২.৭	২৮৫.৩	৩১৩৮
১৩	৩১৩৮	৩১৩.৮	৩৪৫১.৮

ছকে দেখুন, প্রতি বছর সাগর থেকে ২০০টি কড়ি ভেসে আসলে ৯ম বছরে সাম্যাবস্থা ভেঙে যেত। আবার যদি প্রতি বছর সাগর থেকে ৩০০টি কড়ি ভেসে আসতো, ১৩তম বছরেই সাম্যাবস্থা ভেঙে যেত।

উপরের ছকে কেবলমাত্র প্রথম তেরো বছরের হিসেব দেখানো হয়েছে। ছকটি আরও বড় করলে দেখা যেত ভেসে আসা কড়ির সংখ্যা ৪০০, ৭০০ বা ১২০০ যত বেশিই হোক না কেন, সুদের চক্র চলতে থাকলে এক সময় সব কড়িই সুদি মহাজনের হাতে চলে যাবে। এমনকি সুদের হার মাত্র ৫ শতাংশ বা ২ শতাংশ হলেও ঠিক একই ফলাফল সংগঠিত হতো, কেবলমাত্র কিছু বেশি সময় লাগতো। এটিই হলো চক্রাকারে বৃদ্ধির জাদু যা প্রকৃতির সকল স্থানে দেখা যায়।

অনেকে মনে করে থাকতে পারেন চক্রবৃদ্ধিতে সুদ না নিলে সুদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে ঋণ পরিশোধে অপারগ ব্যক্তিকে সময় বাড়িয়ে দিলে বা বিশেষ প্রয়োজনে সুদ মওকুফ করে দিলে, সুদ সমাজের কোনো ক্ষতি করে না। এই ধারণাগুলো বেশ ভালভাবেই ভুল।

রূপসাগরে মহাজন রাজা মিয়া যদি কিছু গ্রাহকের সুদ ক্ষমা করে দিতো অথবা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ গ্রাহকদের কিছু বাড়তি সময় দিতো তাহলেও সব মুদ্রা তার মালিকানাতেই কেন্দ্রীভূত হতো। কেবলমাত্র পূর্বের তুলনায় কিছুটা বেশি সময় লাগতো।

উপরের ছকটি লক্ষ্য করুন। যদিও এখানে সরল হারে সুদ নেয়া হয়েছে, মোট সম্পদের পরিমাণ (সুদাসল) চক্রাকারে বেড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিতে সরল বৃদ্ধি বলে কিছু নেই, সব চক্রবৃদ্ধি। এই নিয়ম কেবলমাত্র সুদ নয় ব্যবসাতেও প্রযোজ্য। দেখুন কিভাবে...

রূপসাগরের নতুন প্রজন্মের একজন মধুর সওদাগরের নাম বাদশা মিয়া। তিনি দ্বীপের দক্ষিণের উত্তাল সাগরপাড়ে অবস্থিত কেওড়া বনের মৌয়ালদের কাছ থেকে মধু কিনে আনেন। বাদশা মিয়া যা কিছু কেনেন, সেটা ২০% লাভে বাজারে বিক্রি করেন। প্রথমে ১০০ কড়ি পুঁজি নিয়ে বাদশা মিয়া ব্যবসা শুরু করলেন। প্রথমবার তিনি মোট ১০০ কড়ি মূল্যের মধু কিনে সেই মধু ১২০ কড়িতে বিক্রয় করে দিলেন। তারপর বাদশা মিয়া ১২০ কড়ির মধু কিনে বাজারে বিক্রি করলেন ১৪৪ কড়িতে। তারপর, ১৪৪ কড়ির পণ্য কিনে বিক্রি করলেন ১৭৩ কড়িতে, তার পরবর্তীকালে ১৭৩ কড়ির পণ্য কিনে ২০৭ কড়িতে বিক্রি করলেন। এভাবে চলতে থাকবে... কিন্তু সরল লাভে ১০০, ১২০, ১৪০, ১৬০, ১৮০, ২০০ কড়ি এভাবে আগানোর কথা ছিল। এমন কেন হল?

এমন হবার কারণ হচ্ছে প্রতিবার তিনি অধিক পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। প্রকৃতির সকল স্থানেই এমনটি দেখা যায়। যেমন – জনসংখ্যা বৃদ্ধি, তেজস্ক্রিয়তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। সুদও তার ব্যতিক্রম নয়। সুদের হার যত সরলই দেখাক না কেন, ঋণের পরিমাণ চক্রাকারে বৃদ্ধি পায় এবং ঋণের হাত ধরে সুদও চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে (আগের চার্টে দেখুন)।

এই নিয়ে একটি ছোট কিচ্ছা শুনুন এবার।

দুর্জনের ছল

সম্রাট আকবর ছিলেন ভারতবর্ষের একজন প্রতাপশালী সম্রাট। কোনো এক বছর ভয়ঙ্কর বন্যায় রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার ধান নষ্ট হয়ে যায়। কিভাবে রাজকার্জ চালাবেন, কোথা থেকে এত বড় সেনাবাহিনীর বেতন ভাতা দিবেন

তা নিয়ে তিনি গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। উপায়ান্তর না পেয়ে সম্রাট আকবর তৎকালীন ধনকুবের মানসিংহের নিকট ১০,০০০টি স্বর্ণমুদ্রা চেয়ে একটি চিঠি পাঠালেন। মানসিংহ সম্রাটের চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়ে তার উত্তরে তিনি লিখে পাঠালেন,

'মহামান্য সম্রাট,
আমার প্রণাম নিবেন। আপনি বিপদে আছেন জেনে খুবই ব্যথিত হলাম। আমি আজই ১০ হাজারটি মোহর আপনার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার সময় সুযোগ মতো যখন পারেন তখন এই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েন। সাধারণত আমি সবার থেকে ১৪ শতাংশ সুদ রাখি। আপনি যেহেতু আমার বিশ্বস্ত মানুষ, প্রতি বছর মোট ঋণের উপর সুদ রাখছি মাত্র ১২ শতাংশ করে। আপনার এই বিপদের দিনে সাহায্য করতে পেরে আমি আজ নিজেকে বড়ই ধন্য মনে করছি।

ইতি
শ্রী মানসিংহ'

বিপদের দিনে মানসিংহের সাহায্য পেয়ে সম্রাটও খুব খুশি হলেন। ধীরে ধীরে দেশের অবস্থার উন্নতি হলো। রাজ-কোষাগার আবারো ধনে রত্নে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো এবং ঋণ নেওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই সব ঋণ পরিশোধ করার মতো অবস্থা হয়ে গেলো। একদিন সম্রাট তার প্রধানমন্ত্রী বীরবলকে ডেকে বললেন, 'বীরবল সাহেব, পাঁচ বছর আগে মানসিংহের থেকে দশ হাজার মুদ্রা ঋণ নিয়েছিলাম। ১২ শতাংশ সুদে ৫ বছরে সুদ আসে ছয় হাজার টাকা। আপনি রাজ-কোষাগার থেকে মানসিংহকে ১৬,০০০টি মোহর পরিশোধ করে দিন।'

বীরবল হিসেব করে বলল, 'সম্রাট, আপনার হিসেবে একটু সমস্যা আছে। এটি তো চক্রবৃদ্ধি সুদ। এই যে দেখুন চিঠিতে লেখা প্রতি বছর মোট ঋণের উপর ১২ শতাংশ করে সুদ। ঋণ নেবার পরে আপনি তো কোনো সুদ পরিশোধ করেননি। অপরিশোধিত সুদ দেনার সমতুল্য। তাই আপনার মোট দেনা চক্রাকারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমস্ত দেনার উপর সুদ যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে আপনার দায় হচ্ছে সাড়ে সতেরো হাজার মুদ্রা যা সরল হারে শতকরা ১৫ শতাংশ সুদের সমান। অর্থাৎ, এই পাঁচ বছর শতকরা ১৫ শতাংশ সরল সুদে যেই দায় আসতো চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা ১২ শতাংশে তার সমপরিমাণ দায় আসছে।'

এদিকে মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিং ছিলো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল একদিন সে সমগ্র ভারতের রাজা হবে। মাত্র পনের বছর বয়সে দুর্জন সিং তার বাবার ব্যবসার দায়ভার গ্রহণ করলো এবং ঠিক একই সময়ে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পরে সম্রাট নিজাম দিল্লির রাজসিংহাসনে বসলো। নতুন সম্রাট নিজামের ক্ষমতায় আসার সুযোগকে কেন্দ্র করে পাঠানরা ভারতে আক্রমণ করে বসলো। যুদ্ধের ব্যয় ভার বহন করতে সম্রাট হিমশিম খাচ্ছেন এবং রাজ কোষাগার শূন্য হয়ে যাচ্ছে দেখে দুর্জন সিং বন্ধু বেশে সম্রাটের দরবারে হাজির। সুমিষ্ট কণ্ঠে দুর্জন সিং বলল, 'আপনার বাবার বিপদের দিনে আমার বাবা যে সাহায্য করেছিলেন তা তো আপনি জানেন। আজ আপনার বিপদের দিনেও আমি আপনার পাশে আছি।' দুর্জন সিংকে পাশে পেয়ে সম্রাট নিজাম খুব খুশি হলেন। এবারে দুর্জন সিং বলল, 'আমিও আমার বাবার মতন আপনাকে ১০ হাজার মোহর ঋণ দিচ্ছি। সুদের হার চক্রবৃদ্ধিতে ১২ শতাংশ। আপনার এই ঋণ এখন পরিশোধ করার প্রয়োজন নেই। আপনার পুত্র যেদিন ক্ষমতায় আসবে তার থেকে আমি আমার পাওনা বুঝে নিয়ে নিব।' নিজাম ভাবলো এটা তো খুব ভালো প্রস্তাব। যুদ্ধের সময় ঋণ পাওয়াই সৌভাগ্যের ব্যপার। তার উপর এই ঋণ জীবন কালে শোধ না করলেও চলবে। খারাপ কি?

সেবার সম্রাট যুদ্ধে জিতে যান এবং যার ঋণের কল্যাণে এই জয় সম্ভব হয়েছে তাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন। দুর্জন সিং তার ঋণের টাকা সম্রাটের থেকে ফেরত নিল না। তবে চুক্তি মোতাবেক সম্রাটের পুত্রের থেকে নিবেন বলে আশ্বাস দেন। ৫০ বছর দাপটের সাথে রাজত্ব করে সম্রাট নিজাম একসময় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পরে তার পুত্র শাহ্ সুলতান দিল্লির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন। শাহ্ সুলতানের অভিষেক অনুষ্ঠানের দিন সবার সাথে দুর্জন সিংও নিমন্ত্রিত ছিল। যুবরাজকে মুকুট পরানো হবে ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্জন সিং বলে উঠলো, 'রাজকুমার শাহ্ সুলতান, ভারতবর্ষ তো আমার। এই মুকুট আমাকে দিন।'

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। দুর্জন সিং এগুলো কি বলছে! সবার অপলক দৃষ্টির সামনে তিনি কাগজ বের করে বলল 'এই যে দেখুন, সম্রাট নিজাম আমার থেকে ৫০ বছর আগে ১২ শতাংশ সুদে ১০,০০০টি মুদ্রা ঋণ নিয়েছিলেন। আজকের সভায় তো জ্ঞানী গুণী অনেক ব্যক্তিই এসেছেন। একটু হিসেব করে বলেন দেখি সম্রাটের বর্তমান দায় কত?'

রাজ মনীষী সব কিছু শুনে কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করতে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ হিসেব করে তিনি সব কিছু কেটে দিয়ে আবারো নতুন করে হিসেব করতে বসলেন। কি যেন একটা সমস্যা হচ্ছে। এভাবে কয়েক বার হিসেব করে যখন দেখলেন বার বার একই মান আসছে। মনীষী কাঁপা কাঁপা গলায় সবার সামনে ঘোষণা দিলেন, 'সম্রাটের বর্তমান দায় ২৮ লক্ষ ৯০ হাজার ২১ স্বর্ণমুদ্রা। ৫০ বছরে ১২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রতি বছর ৫৭৬ শতাংশ সরল সুদের সমান। রাজকোষে এর সিকিভাগ মুদ্রাও নেই। প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঋণ অনাদায়ে রাজ্যের মালিকানা দুর্জন সিংয়ের হাতে হস্তান্তর করা হোক। আজকের সভায় দুর্জন সিং রাজ মুকুটের উত্তরাধিকারী।'

এই হলো চক্রবৃদ্ধির ম্যাজিক। এবার হিসেব করে দেখুন ৫০ বছর পরে আমাদের দেশের ব্যাংকের কাছে কি অবস্থা হতে পারে?

'Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it ... he who doesn't....pays it.'

– Albert Einstein

'চক্রবৃদ্ধি সুদ হল পৃথিবীর ৮ম আশ্চর্য। যে বুঝে, সে আয় করে আর যে বুঝে না, সে ব্যয় করে।'

– আলবার্ট আইনস্টাইন

আইনস্টাইন যেটাকে পৃথিবীর ৮ম আশ্চর্য বলছে, সেটা যে সাধারণ মানুষের 'আকল'-এর নাগালের বাইরে থাকবে এটাই স্বাভাবিক! আমাদের 'আকল' যেন 'বিকল' না করি সেই প্রত্যাশাই রইলো!

কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ও বিখ্যাত পদার্থবিদ আলবার্ট এ. বার্টলেটও একবার বলেছিলেন, :

'The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.'

– Albert Allen Bartlett

'মানবজাতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল তারা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন (ক্রমবর্ধমান ধারা) বুঝতে পারে না।'

– আলবার্ট এ. বার্টলেট

গণিত নিয়ে জীবন কাটানো এরকম মনীষীদের এরকম উপলব্ধির গভীরতা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

চিন্তার খোরাক

- ধরি, জাপান সম্রাট কোতোহিতো ১৬১২ সালে তৎকালীন বাংলার সুবাদার ইসলাম খান চিশতিকে ঢাকার উন্নয়নের মাত্র ১ শতাংশ সুদে ১ কোটি ইয়েন ঋণ দিলেন। শর্ত হলো :

  ১। সুবাদার ও পরবর্তী সব শাসক শুধু সুদ পরিশোধ করবেন

  ২। সুদ ও আসলের পরিমাণ প্রতি বছর ঢাকার 'মূল্যস্ফীতি' অনুযায়ী 'এডজাস্ট' হবে।

  তাহলে, বর্তমানে জাপান কত টাকা সুদ পেত আর মূল কত টাকা ঋণ জাপানের পাওনা থাকত?
- ১০০ বছরে ১২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি সুদ বছরে কত শতাংশ সরল সুদের সমান?
- আপনার দেশে ব্যাংক ব্যবস্থার সুদের হার কত?
- বর্তমানে সব ব্যাংকের হাতে যদি দশ হাজার কোটি টাকা থাকে চলমান সুদের হারে ১০০ বছর পরে ব্যাংকের হাতে কত টাকা থাকবে?

২. অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে কি হবে?

রূপসাগরের রাজা মিয়া যদি সব সুদ ঋণে না খাটিয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ করতো সেক্ষেত্রে কি ভারসাম্য বজায় থাকতো?

উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে মুদ্রার ভারসাম্য বজায় থাকতো। কারণ, ব্যবসায় বিনিয়োগ করার ফলে সুদের কড়ির মালিকানা পরিবর্তিত হতো এবং সিন্দুকের সকল কড়ি মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে যেত। এভাবে, সুদ থাকা সত্ত্বেও ভারসাম্য বিঘ্নিত হতো না। এমনকি প্রতি বছর ভেসে আসা কড়ির পরিমাণ অপেক্ষা সুদের পরিমাণ বেশি হলেও ভারসাম্য বিঘ্নিত হতো না।

সাগর থেকে ভেসে আসা কড়ির পরিমাণ ১০০ হলে এবং মহাজনের বার্ষিক সুদ ১২০ কড়ি হলে কিভাবে ভারসাম্য থাকবে তা হয়তো আপনাদের ভাবিয়ে তুলছে। একবার মনে মনে কল্পনা করুন, দ্বীপে আপনার একটি বাড়ি আছে এবং প্রতি বছর বাড়ির ভাড়া বাবদ আপনি ১২০ কড়ি পাচ্ছেন। এই ভাড়ার পুরোটাই আপনি ব্যবসায় খাটাচ্ছেন। ঠিক তেমনি করে রাজাও সুদের কারবার থেকে প্রাপ্ত ১২০ কড়ির সমস্তটাই বিনিয়োগ করছে। কোনো তফাত দেখতে পাচ্ছেন? না। ঠিক এই কারণেই উভয় ক্ষেত্রে একই কারণে ভারসাম্য বজায় থাকতো।

তবে সুদের ক্ষেত্রে একটি ঝামেলা হচ্ছে ব্যবসায় মুনাফার পরিমাণ কমে আসলে মহাজন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সুদে ফিরে যেত। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে, যেখানে ঋণ ব্যবসা করে সব কড়ি অর্জন করা সম্ভব, সেখানে সম্পূর্ণ আয় ব্যবসায় বিনিয়োগ করা একপ্রকার ভুল সিদ্ধান্ত। তাই এই সাম্যাবস্থা বাস্তবে টিকতো না।

একারণেই আমাদের চারিদিকে আমরা কাউকে সুদ ছেড়ে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে তেমন দেখিই না বলা যায়, বরং একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এক পর্যায়ে সুদী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে পাক্কা সুদখোর হয়ে গেছেন এমনটাই দেখি। (আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক।)

৩. সব সুদ নিজের ব্যয়ভার মেটাতে খরচ করে ফেললে কি হবে?

সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। একজন সুদী মহাজন যদি সব সুদ তার নিজের ও নিজ পরিবারের পেছনে ব্যয় করে ফেলে (ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে), সেক্ষেত্রে কি মুদ্রার ভারসাম্য বজায় থাকবে? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ থাকবে। কারণ এক্ষেত্রে সুদের আয়ের সব কড়িই সমাজে ফেরত যাবে, ঋণ বৃদ্ধি পাবে না এবং কড়ির মালিকানা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তবে, এই সাম্যাবস্থাটা একটু নাজুক। ঋণ সামান্য পরিমাণে 'একবার' বৃদ্ধি পেলেই তা চক্রবৃদ্ধিতে ফুলেফেঁপে উপরের ফলাফলে পৌঁছে যাবে।

এই বিষয়টি আমাদের জন্য জানা জরুরি যে সব মুদ্রা একজন ব্যক্তির হাতে আসা এবং সব সম্পদ একজন ব্যক্তির হাতে আসা এক কথা না। মুদ্রা একহাতে কুক্ষিগত হওয়ার পরও সবার জায়গা-জমি, বাগান-পুকুর ও ঘর-বাড়ি সব আগের মতই থাকবে। তবে সুদী মহাজন তার পছন্দের ব্যক্তিদের ঋণ (মুদ্রা) দিয়ে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে, আবার তার শত্রুদের ঋণ না দিয়ে শাস্তিও দিতে পারে। এভাবে সুদের দ্বারা একটি রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হওয়ার পাশাপাশি সুদী প্রতিষ্ঠানের ছায়া স্বৈরাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের গল্পে যেহেতু রাজা নামক ব্যক্তির হাতে সব মুদ্রা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, রাজা তার পছন্দের ব্যক্তিকে ক্ষমতায় আনতে পারবে আবার তার অপছন্দের ব্যক্তিকে ঋণ না দিয়ে অসহায় করে রাখতে পারবে। এমনকি কোনো জনপ্রিয় শাসক যদি রাজার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় সে মোট ঋণ সরবরাহ (বা মুদ্রা প্রবাহ) কমিয়ে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে!

পৃথিবী বিখ্যাত রথসচাইল্ড পরিবারের নাম শুনেছেন? তাদেরকে কেন দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশীল পরিবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়? সেই পরিবারের একজনের কাছ থেকেই শুনে নিন.

> 'I care not what puppet is placed upon the throne of England to rule the Empire on which the sun never sets. The man who controls Britain's money supply controls the British Empire, and I control the British money supply.'
>
> – Nathan Mayer Rothschild
> English-German Banker, Businessman and Financier (1777-1836)

> 'যেই সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যায় না, তার সিংহাসনে কে বসল আমার তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ যে ব্রিটেনের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ক্ষমতার মালিক, আর ব্রিটেনের মুদ্রাব্যবস্থা আমারই নিয়ন্ত্রণে।'
>
> – নাথান মায়ের রথসচাইল্ড
> ইংরেজ-জার্মান ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও ফাইন্যান্সিয়ার (১৭৭৭ -১৮৩৬)

নাথান রথসচাইল্ড বলেননি যে অনেকগুলো টাকা হাতে থাকলেই একজন ব্যক্তি ক্ষমতার মালিক হয়ে যাবেন, বরং তিনি বলেছেন টাকার সরবরাহ যার নিয়ন্ত্রণে (control of money supply) আছে, তিনিই একটি রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতার মালিক। এই ক্ষমতাটাই সুদী মহাজন বা ব্যাংকগুলোর কাছে আছে। মহাজন/ব্যাংক ঋণ নবায়ন না করলে (বাজার থেকে টাকা তুলে নিলে) যেমন টাকার সংকট সৃষ্টি হয়, ঠিক তার বিপরীত ক্রিয়া সংঘটিত হয় ঋণ দিলে (টাকা পুনরায় বাজারে প্রবেশ করে এবং মুদ্রা সংকট কেটে যায়)। এভাবে একজন সুদ কারবারি (বা ব্যাংক ব্যবস্থা) মুদ্রা সংকট সৃষ্টি এবং নিরসন করতে পারে।

> 'The money powers prey upon the nation in times of peace and conspire against it in times of adversity. It is more despotic than a monarchy, more insolent than autocracy, and more selfish than bureaucracy. It denounces as public enemies, all who question its methods or throw light upon its crimes'
>
> – Abraham Lincoln
> 16th American President

> 'মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা' হল শান্তির সময় শিকারি এবং অশান্তির সময় ষড়যন্ত্রকারী। এটি রাজার চেয়ে ক্ষমতাবান, একনায়কের চেয়ে স্বৈরাচারী এবং আমলাদের চেয়ে স্বার্থপর। যে ব্যক্তিই এ অন্যায় ব্যবস্থার বিরোধিতা করে মানুষকে দৃষ্টিকে উন্মোচন করবে, তাকেই জাতির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।'
>
> – আব্রাহাম লিংকন
> ১৬তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি

অর্থনীতি

একটি অর্থনীতিতে মোট মুদ্রার পরিমাণ কমে গেলে কি হয়? একই সাথে সম্পদ, পণ্যমূল্য, মানুষের আয় এবং ব্যয় সমান তালে কমে যায়। অর্থনীতির ভাষায় একে বলে মূল্যহ্রাস বা ডিফ্লেশন। মূল্যহ্রাসের কারণে সবকিছু সংখ্যায় পরিবর্তিত হয়ে গেলেও অর্থনৈতিক অবস্থা 'প্রায়' আগের মতই থাকে। কারণ মোট মুদ্রার পরিমাণ এবং মোট উৎপাদনের মাঝে স্থায়ী কোনো সম্পর্ক নেই। মুদ্রা সংকট তাই দীর্ঘমেয়াদি কোনো সমস্যা নয়। ধীরে ধীরে নতুন আঙ্গিকে সব ঠিক হয়ে যায়। বিষয়টি ভালো ভাবে বোঝানোর জন্য একটি প্রশ্ন করি :

একটা দেশে টাকার পরিমাণ কমে গেলে কি সেই দেশের খাদ্যশস্য পচে যায়? শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়? ঘরবাড়ি মাটির সাথে মিশে যায়? কিংবা কোনো ব্যক্তি মারা যায়?

না, এগুলো কিছুই হয় না, বরং সবকিছু আগের মতই থাকে। যে জিনিস (টাকা) কোনো কিছুই ধ্বংস বা সৃষ্টি করতে পারলো না, তা বাড়া বা কমায় কি আসে যায়?

ঠিক বলেছেন। কিছুই আসে যায় না। ধরুন, কোনো দেশের নাগরিক পরানের বর্তমান আয় মাসে ১ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৮০ হাজার টাকা এবং পৈতৃক সম্পত্তির মূল্য ১ কোটি টাকা। একদিন দূর দেশ থেকে একদল শত্রু এসে সবার অর্ধেক টাকা ডাকাতি করে নিয়ে গেল। এতে দেশের মোট টাকার পরিমাণ কমে অর্ধেক হয়ে বাজারে মুদ্রা সংকট শুরু হয়ে গেল। কিছুদিন পরে দেখা গেল সবার আয় এবং ব্যয়ও কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। পরান হিসেব করে দেখল তার আয় আগে ছিল ১ লক্ষ টাকা কিন্তু এখন হয়ে গেছে ৫০ হাজার টাকা, আবার একই সময়ে ব্যয় কমে হয়ে গেছে ৪০ হাজার টাকা এবং সম্পত্তির মূল্য কমে হয়ে গেছে ৫০ লক্ষ টাকা। এমন ঘটনা কেবল পরানের সাথেই নয়, দেশের সবার সাথেই সমান ভাবে ঘটবে। এতে দেশের মোট

খাদ্যের উৎপাদন কমবে না, কেউ অপুষ্টিতে ভুগবে না, শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে না, কেউ দারিদ্র্যে ভুগবে না। এতে কেউ কিছু হারাবে বা পাবেও না। শুধু কিছু সংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটবে এবং বাদবাকি সবকিছু আগের মতই থাকবে।

এই চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় যখন একটি দেশের জনগণ ঋণগ্রস্ত হয়। মুদ্রা সংকট শুরু হবার পূর্বে যেসকল ব্যক্তি ঋণ নিয়েছিল সংকটের কারণে তাদের হাতে মুদ্রার পরিমাণ কমে গেলে তারা ঋণ বা সুদ কিছুই পরিশোধে করতে পারবে না। উপরের উদাহরণে পরানের কথাই চিন্তা করেন, সে যদি গত বছর তার পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক রেখে ৬৫ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়ে থাকতো, বর্তমানে তার কি অবস্থা হতো? মুদ্রা হ্রাস শুরু হবার পরে তার পৈতৃক সম্পত্তির মূল্য কমে হয়ে যেত ৫০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, মোট দায় মোট সম্পত্তির চেয়ে বেশি হয়ে যেত। এভাবে, পরান দেউলিয়া হয়ে ভিটেমাটি হারাতো।

একই বিষয় আরেকভাবে চিন্তা করে দেখুন– পরান ঋণ নিয়েছিল ৪০ লক্ষ টাকার এবং ঋণের বিপরীতে তাকে প্রতি মাসে সুদ গুণতে হতো ২০ হাজার টাকা। পূর্বে মাসে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করার পরে বাকি ২০ হাজার টাকাই সে সুদ হিসেবে প্রদান করতো। বর্তমানে আয় কমে হয়ে গেছে ৫০ হাজার টাকা। এই ৫০ হাজার টাকা থেকে সে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করার পর হাতে থাকে মাত্র ১০ হাজার টাকা। এবারও সে দেউলিয়া হয়ে যাবে। এমনটি হবার কারণ হচ্ছে ডিফ্লেশনের সময় অন্য সব কিছুর মূল্যহ্রাস হলেও ঋণ এবং সুদের দায় ঠিক আগের মতোই থাকে। তাই একটি ঋণগ্রস্ত সমাজে মুদ্রাহ্রাস শুরু হলে দেউলিয়া ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, শ্রমিকরা চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে যায়, অনেকেই অপুষ্টিতে ভুগে, আত্মহত্যা করে এবং দেশের মোট উৎপাদন হ্রাস পায়। এক কথায় ঋণগ্রস্ত জাতিকে মুদ্রাসংকটের চরম মূল্য দিতে হয়, যা আন্দোলন এবং অসন্তোষ সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ব্যাংকাররা এই পরিস্থিতি তৈরি করলে রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ কিছু করার থাকে না, তাদের থেকে বেশি বেশি ঋণ নেওয়া ছাড়া।

কারণ, ব্যাংক মুদ্রা কুক্ষিগত করলে যেমন মুদ্রাসংকট তৈরি হয়, ঠিক তেমনি ঋণ দিলে মুদ্রা কুক্ষিমুক্ত হয়ে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। এভাবে সমাজের সবার হাতে হাতে মুদ্রা পৌঁছে যায় এবং দেউলিয়া হবার হুমকি থেকে মুক্তি পায়। তাই কল কারখানা সচল থাকে, শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত

থাকে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক ভাবে চাঙ্গা থাকে। এভাবে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঋণ নবায়নের প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

(বি. দ্র.-সুদের মুদ্রা হচ্ছে সুদী মহাজনের ক্ষমতার হাতিয়ার। সব মুদ্রা সিন্দুকে অকেজো পড়ে থাকা ক্ষমতার কলকাঠি অকেজো হয়ে পড়ে থাকার শামিল। আর হাতে প্রচলিত মুদ্রা না থাকলে সবাই অন্য কিছু দিয়ে লেনদেন করা শুরু করলে মহাজনের ক্ষমতার শোচনীয় পতন ঘটবে।)

একটি রাজ্যের মুদ্রা স্বর্ণের হোক, কি কড়ি বা কাগুজ যাই হোক না কেন, যে কারেন্সিতে সুদের লেনদেন চলে তা টিকিয়ে রাখাই সুদ কারবারিদের লক্ষ্য এবং এর মাঝেই তার ক্ষমতা নিহিত। আইন প্রণয়ন করে এই মুদ্রাকে একমাত্র লিগাল টেন্ডার হিসেবে ঘোষণা করে দিলে (বা বাদবাকি সব মুদ্রাব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করা হলে), আইনত সুদ কারবারিদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই বিশ্লেষণ নতুন না এবং কারো অজানা না, বরং সাধারণ জনতার গুরুত্ব না দেয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি। নিচে এক শতাব্দী আগের একজন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও আইনজ্ঞের উক্তিটি পড়ুন:

'They know in advance when to create panic to their advantage. They also know when to stop panic. Inflation and deflation work equally well for them when they control finance'

– Charles A. Lindbergh
US Congressman & Lawyer (1859 - 1924)

'তারা আগে থেকেই জানে কখন সংকট সৃষ্টি করলে তাদের স্বার্থ হাসিল হবে। তারা আরও জানে কখন সংকট নিরসন করতে হবে। মূল্যস্ফীতি এবং মূল্যহ্রাস দুটাই তাদের স্বার্থ উদ্ধারে সমানভাবে কাজ করে। কারণ, তারাই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

– চার্লস এ. লিণ্ডবার্গ
মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও আইনজ্ঞ (১৮৫৯-১৯২৪)

'Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws!'

– Mayer Anselm Rothschild
Founder of the Rothschild banking dznasty & founding father of international finance (1744 - 1812)

'আমাকে কেবল টাকা তৈরি এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দাও, সেই জাতির আইন কার হাতে তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।'

– এম. অ্যানসেল্ম রথসচাইল্ড

রথসচাইল্ড ব্যাংকিং যুগ এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সের জনক (১৭৪৪-১৮১২)

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যবসা কাঠামো বিশ্লেষণ

ব্যবসা নিয়ে গভীর বিশ্লেষণে যাবার পূর্বে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ব্যবসায় দুর্নীতি, প্রতারণা, গুদামজাতকরণ এবং উৎকোচ প্রদান সহ বিভিন্ন প্রকার অসাধু কার্যকলাপ জড়িত থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই সবরকম কার্যকলাপ সুদের সাথেও জড়িত থাকতে পারে। যেমন – একজন ব্যাংকার (বা সুদ কারবারি) কাউকে ঘুষ দিতে পারে, মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলতে পারে, চাঁদাবাজি করতে পারে। এমন হাজারটা অসাধু উপায় আছে তাই তো? সেগুলো আমরা আমাদের আলোচনায় আনছি না কেন? আনছি না এজন্য যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কাঠামোগত বিশ্লেষণ করা। মানব চরিত্র কিংবা প্রচলিত আইনের প্রতিটি ফাঁকফোকর আলোচনায় আসলে সেই উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, সুদ যদি সবার জন্য উপকারী হতো এবং অসাধু মহাজন কর্তৃক সুদচর্চার কারণে এর উপকার থেকে সমাজ বঞ্চিত হতো, তাহলে আমরা সুদকে খারাপ বলতে পারতাম না। বরং আমরা ওই সকল ব্যক্তিরই দোষারোপ করতাম যাদের কারণে একটি ভালো জিনিস খারাপ হয়ে গেল। ঠিক তেমনি করে দুর্নীতি, চুরি, প্রতারণা ইত্যাদি দ্বারা যদি ব্যবসা কাঠামোর সুফল নষ্ট হয়ে যায়, আমরা তার জন্য ব্যবসাকে দায়ী করতে পারি না।

এসকল কারণে কাঠামোগত বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই ধরে নিতে হয় সমাজের সকলে প্রচলিত আইনের মধ্যে থেকে কাজ করবে। এজন্য উপরের আলোচনায় আমরা রিবা কিংবা রাজাকে কোনো আইন ভঙ্গ করতে, মিথ্যা কথা বলতে বা দুর্নীতি করতে দেখি নাই। ঠিক একই কারণে আমাদের ব্যবসায়ীদেরকেও একচেটিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ এবং ভোক্তা অধিকার বিনষ্টকরণে অংশগ্রহণ করতে দেখব না। এমনটা করলে আমরা খুব স্বচ্ছ ভাবে সমাজ এবং অর্থনীতিতে এই দুই কাঠামোর নিরেট প্রভাব দেখতে এবং তুলনা করতে পারব।

যাই হোক, আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে ব্যবসা করে সকল মুদ্রা কুক্ষিগত করা সম্ভব না। কিন্তু, 'সুদ মুদ্রাকেন্দ্রিক দেখে সুদ কারবারি সব মুদ্রা নিজ হস্তগত করতে পারেন, সেই হিসেবে ব্যবসা সম্পদকেন্দ্রিক বলে কি একজন ব্যবসায়ী সব 'সম্পদ' হস্তগত করতে পারবেন?'

ঐতিহাসিক ভাবেই এই প্রশ্নটির উত্তরও হচ্ছে, 'না'। তবে তাত্ত্বিক উপায়ে এর উত্তর না প্রমাণ করা যায় কি? চারটি কারণে ব্যবসা প্রক্রিয়া দ্বারা তাত্ত্বিক ভাবেই সকল সম্পদ দখল করা সম্ভব না।

প্রথম কারণ– ব্যবসার প্রসার বা সুযোগের সীমা থাকা

পরিসর সীমিত হওয়ায় প্রতিটি ব্যবসা বৃদ্ধিরই সর্বোচ্চ সীমা আছে। সেই সীমায় পৌঁছে যাবার পরে ব্যবসা তার বৃদ্ধি হারিয়ে ফেলে।

উদাহরণস্বরূপ পলাশ তাদের বাসার গলির মুখে একটা মুদি দোকান দিল। গলিতে ৩০টা পরিবার থাকলে আর সবাই সকল মুদি পণ্য পলাশের কাছ থেকে কিনলে দোকানের বৃদ্ধি এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। ব্যবসায় নতুন প্রবৃদ্ধি আনতে নতুন বিনিয়োগ করে অন্য গলিতে দোকান খুলতে হবে। কিন্তু অন্য গলিতে আগের থেকেই দোকান আছে এবং পলাশ একে একে পৃথিবীর সকল দোকানকে প্রতিস্থাপনও করতে পারবে না (কারণ নিম্নে)।

দ্বিতীয় কারণ– সীমিত সম্পদের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি

একজন ব্যক্তি যতো সম্পদ কুক্ষিগত করেন, বাদবাকি সব সম্পত্তির মূল্য তত বেশি বৃদ্ধি পায়। এভাবে ক্রমাগত সম্পত্তি কিনতে থাকলে অন্যান্য সম্পদের দাম বাড়তে থাকে, যার ফলে পরবর্তী সম্পত্তিগুলো ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকে বা চলে যায়।

যেমন : ২০ বছর আগে আমেরিকার একর প্রতি কৃষি জমির দাম ছিল প্রায় এক/দেড় হাজার ডলার। মাইক্রোসফটের মালিক বিল গেটস নামে-বেনামে জমি কিনতে কিনতে এখন বেসরকারি বা সিভিলিয়ান হিসেবে আমেরিকার সর্বোচ্চ কৃষি জমির মালিক। তাঁর দেখাদেখি আরো অনেক ধনকুবের এই কাজ করেছেন এবং এর ফলশ্রুতিতে ২০ বছর পরে কৃষি জমির দাম এখন একর প্রতি ৩ হাজার ডলারেরও বেশি। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে, নতুন করে আগের পরিমাণ জমি কিনতে দ্বিগুণেরও বেশি খরচ করতে হচ্ছে, যেটা কার্যত তাদের নতুন সম্পদ অর্জনের কাজ কঠিন করে তুলছে।

তৃতীয় কারণ– নির্ভরশীলতা

প্রতিটি ব্যবসায়ীকেই অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করতে হয় এবং এই লেনদেনের ফলে উভয় পক্ষের সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

যেমন : পাঠাও এখন খুব ভাল একটা রাইড শেয়ারিং সার্ভিস। পাঠাও ব্যবসা করে মিলিয়ন ডলার অর্জন করছে এবং ক্রমাগত অন্যান্য সার্ভিসে বিনিয়োগ করছে। পাঠাও এর সাথে সাথে চালকরাও মোটরসাইকেল ও গাড়ি কিনছে। এই যে ওয়ালটনের মোটরসাইকেল আর জাপানের টয়োটার বেশি বিক্রি হচ্ছে, সেই কোম্পানির লোকজন বেশি আয় করছেন, জমি কিনছে ইত্যাদি। এভাবে একজনের সাফল্যের কারণে অপরাপর ব্যবসায় পার্টনাররা উপকৃত হচ্ছে ও সম্পদের মালিক হচ্ছে।

চতুর্থ কারণ- দক্ষতার সীমা

কোনো প্রতিষ্ঠান সব কাজে সমান পারদর্শী হতে পারেন না। এক একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এক একটি কাজে দক্ষ হয়ে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ যেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইটি খাতে বিশেষজ্ঞ তারা নিশ্চয়ই একই সাথে শল্যচিকিৎসা, কৃষিকাজ কিংবা তৈরিপোশাক খাতে সমান পারদর্শী হতে পারবে না। সবাই সব কাজ সমান দক্ষতার সাথে করতে পারে না। তাই এক একটি খাতে এক একটি কোম্পানি (বা ব্যক্তি) নেতৃত্ব স্থান ধরে থাকে।

নয়নতারার ব্যবসা

পুরো প্রক্রিয়াটা আরেকটু বিস্তারিত বুঝতে আমদের চিন্তার জাহাজ রূপসাগরে ভাসানো যাক।

পিতার ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বুলবুল সাহেবের কন্যা 'নয়নতারা' খুব ভালোভাবেই শিখেছে, 'ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে বিনিয়োগ করার কোনো বিকল্প নেই।' বুলবুল সাহেবের মৃত্যুর পরে সেই মোহর ভর্তি সিন্দুক এবং সাগর পাড়ের বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে নয়নতারা অর্জন করেছে। হাতে পেয়ে নয়নতারা সিন্দুক খুলে দেখলো এর মাঝে মোট ১০০টি মোহর সঞ্চিত আছে। এই পুঁজি চাইলে সে সুদে অথবা ব্যবসায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে খাটাতে পারে।

ধরা যাক, রূপসাগরে মাছের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। এই ব্যবসায় গড় রিটার্ন ২০% (১০০টি মুদ্রা বিনিয়োগ করলে বছরে লাভ আসে ২০টি মুদ্রা)। অপরপক্ষে, দ্বীপে সুদের হার মাত্র ১০% (১০০টি মুদ্রা বিনিয়োগ করলে বছরে লাভ আসে ১০টি মুদ্রা)। তাই নয়নতারা, সুদে টাকা না খাটিয়ে, খুব ঘটা করে কিছু সংখ্যক নৌকা ক্রয় করে মাছের ব্যবসায় নেমে পড়ল। সবকিছু ঠিক থাকলে মাত্র পাঁচ বছরে সে আয় করবে ১০০টি মুদ্রা। অতঃপর সে পুনরায় বিনিয়োগ করে নৌকার সংখ্যা দ্বিগুন করে আরও পাঁচ বছরে আয় করবে ২০০টি মুদ্রা, আরও পাঁচ বছর পরে সে আয় করবে ৪০০টি মুদ্রা এবং আরও পাঁচ বছরে ৮০০টি মুদ্রা... এভাবে চক্রাকারে তার আয় বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এমন হওয়া কি সম্ভব?

উত্তর হচ্ছে, অসম্ভব। মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলেই বাজারে মাছের দাম পড়ে যাবে। তাই নয়নতারার লাভও ক্রমাগত কমে আসবে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রূপসাগরে ক্রেতার সংখ্যা সীমিত। শুধু রূপসাগর নয়, পৃথিবীর প্রতিটি জাতিতেই ক্রেতার সংখ্যা সীমিত। তাই পৃথিবীর কোথাও বিক্রির পরিমাণ অনন্তকাল বৃদ্ধি করা সম্ভব না। একটি সীমার পরে ক্রেতাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ক্রেতার সংখ্যা এবং ক্রেতা একটি পণ্য (যেমন মাছ) কতো বেশি খেতে পারবে তার সীমা আছে। একারণে সব ব্যবসা বৃদ্ধিরই একটি সীমা আছে।

সরবরাহের দিকে নজর দিলেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। কোনো জলাধারে মাছের সরবরাহ সীমিত। তাই নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই সমানতালে মাছের শিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না। এভাবে নৌকা অনুপাতে মাছ ধরা পড়ে কম, তাই উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।

চৌকশ ব্যবসায়ী নয়নতারা বিষয়গুলো বুঝতে পেরে আর মাছের দিকে না ঝুঁকে কিছু সংখ্যক গবাদি পশু ক্রয় করে পশুপালনে নেমে পড়লো। এই ব্যবসাতেও একটি নির্দিষ্ট সীমার পরে আর আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হলো না। কারণ–

প্রথমত, রূপসাগরে দুধ এবং মাংসের চাহিদা সীমিত।

দ্বিতীয়ত, কোনো পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বাকি সবকিছু আগের মত থাকলে এর বাজারমূল্য কমে যায় অর্থাৎ, রূপসাগরেও দুধ এবং মাংসের বাজার মূল্য কমে যাবে।

তৃতীয়ত, নয়নতারা চাইলেই ইচ্ছামত চারণভূমি সম্প্রসারণ করতে পারবে না। তাই পশুর সংখ্যাও অনন্তকাল বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

চতুর্থত, নয়নতারার একার পক্ষে একই সাথে মাছ ধরা এবং গবাদি পশু পালন করা সম্ভব নয়, তাই তাকে নতুন কর্মী নিয়োগ করতে হবে এবং এভাবে ব্যবসার খরচও বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।

সব মিলিয়ে নয়নতারা এবারেও ফেঁসে যাবে। অনেক চেষ্টা করার পরেও মোট সম্পদের পরিমাণ সামনের দিকে দ্রুত টেনে নিতে পারবে না। নয়নতারা যদি একের পর এক বাড়ি নির্মাণ করে ভাড়া দিত তাহলেও একটি পর্যায়ের পরে বাড়ি খালি পড়ে থাকত, কারণ ভাড়া থাকার মত এত মানুষ দ্বীপে নেই! সব কিছুরই একটি সীমা আছে।

রূপসাগরের মতো পৃথিবীর সব অঞ্চলে ব্যবসার ক্ষেত্রে এরকম সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এমনকি যেসকল ব্যবসা সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক, সেগুলোও পৃথিবী নামক দ্বীপের সীমাদ্ধতার ফাঁদে পড়ে যায়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন মার্কেট তৈরি বা ব্যবসা বহুমুখীকরণ করে থাকে। তাই লাভের ধারা বজায় রাখতে রূপসাগরের নয়নতারাকেও প্রতিনিয়ত নতুন নতুন খাতে টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা সম্প্রসারণের ধারা অব্যহত রাখতে হবে। এভাবে নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়ার সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার সংগ্রামও চলতে থাকবে।

ধরা যাক, নয়নতারা পরিকল্পনা করল সাগর পাড়ের বাড়িটি আরও সম্প্রসারণ করে নতুন কাউকে ভাড়া দিবে। কিন্তু সেই বাড়িটির পাশের জায়গার মালিক বকুল নামের একজন দরিদ্র চাষি। নয়নতারা বকুলকে বলল, 'আমার কাছে আপনার জায়গাটি বিক্রি করে দিন। এর বিনিময়ে আমি দশটি সোনার মোহর দিতে প্রস্তুত আছি।' বকুল একটু সময় চেয়ে বলল, 'আমি চিন্তা করে দেখি।'

কিছুদিন যেতে না যেতেই এলাকার ধনাঢ্য বিধবা এবং সফল উদ্যোগতা জুঁই ভাবী এসে হাজির। জুঁই ভাবী বকুলকে বলল, 'আমি তো পরিকল্পনা করেছিলাম এখানে একটি পশুর খামার তৈরি করব। শুনেছি নয়নতারা এই জমির দাম দশ মোহর বলে গেছে। আমি যদি আপনাকে এগারো মোহর দেই জমিটি আমার কাছে বিক্রি করবেন?' বকুল সব শুনে বললো, 'আমি নয়নতারার সাথে যোগাযোগ করে নেই আগে।'

এবার বকুল নয়নতারার সাথে যোগাযোগ করে বারোটি মোহরের বিনিময়ে জায়গাটি বিক্রি করে দিল।

লক্ষ্য করুন, বকুল একজন সাধারণ চাষি। সে কোন দিন ব্যবসা করেনি এবং করবেও না। দ্বীপে যে নতুন নৌকা তৈরি হলো, খামার তৈরি হলো, বাড়ি নির্মাণ করা হলো তার কোন কিছুর সাথেই সে জড়িত ছিলো না এবং

নাইও। তারপরেও তার সম্পদের দাম বেড়ে গেলো। এভাবে সীমিত সম্পদ হস্তগত করার জন্য ব্যবসায়ীরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে থাকে এবং ব্যবসা প্রতিযোগিতা দ্বারা সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে যায়। তখন যারা ব্যবসার সাথে জড়িত নয় তারাও সম্পদশালী হতে থাকে। কেবল বকুল একা নয়, তার প্রতিবেশী শাপলা, শিমুলসহ এলাকার সবাই এর দ্বারা সম্পদশালী হয়ে যাবে। কারণ, এখন থেকে এলাকার সবার ওই পরিমাণ জমির দামই ১২ মুদ্রা বলে বিবেচ্য হবে। শুধু জমি নয়, অন্যান্য সম্পদ যেমন– ঘর-বাড়ি, বাগান, গাছ সব কিছুই ব্যবসা প্রতিযোগিতা দ্বারা মূল্যমানে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি যতো বেশি সম্পদ কুক্ষিগত করতে চাইবেন, বাদবাকি সব সম্পত্তির মূল্য ততো বেশি বৃদ্ধি পাবে। তাই সীমিত সম্পদের পৃথিবীতে কিনে কিনে কখনও সব সম্পদ কুক্ষিগত করা কোন ব্যবসায়ীর দ্বারা সম্ভব নয়।

আরেকটি বিষয় হলো নয়নতারা চাইলেও সব ব্যবসা করতে পারবে না। নয়নতারা যদি চাইতো রূপসাগরের প্রসিদ্ধ তাঁতি টগরকে তাঁত ব্যবসায় টক্কর দিবে, বিশেষ প্রযুক্তি ব্যতীত তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হত না। টগর সবার কাপড় বুনছে মানে এই কাজে সেই সবার চেয়ে দক্ষ। কেবল মাত্র টাকা থাকলেই এই ব্যবসা হস্তগত করা যাবে তা নয়।

তারপরেও ধরে নেই, সব সম্পদ অর্জনের লোভ সামলাতে না পেরে নয়নতারা এই ব্যবসাতেও হস্তক্ষেপ করবে বলে ঠিক করলো। টগর ব্যাটা মহাচতুর। সুযোগ বুঝে তার ব্যবসা নয়নতারার নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করে চুপচাপ বসে রইল। কিছুদিনের মধ্যেই সবাই দেখবে কাপড়ের মান আগের তুলনায় খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক এই সুযোগে টগর তার জমানো টাকা দিয়ে আরেকটি তাঁত নির্মাণ করে কাপড় বুনা শুরু করবে এবং সবাই তার কাছ থেকেই কাপড় কিনবে। এভাবে নয়নতারার বিনিয়োগ মাঠে মারা যাবে।

নয়নতারা যদি টগরকেই নিজ কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ব্যবসা শুরু করতো, তাতেও বিশেষ উপকার হতো না। কিছুদিনের মাঝেই সে নিজের মূল্য বুঝে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করে দিতো।[4]

---

৪ অথবা নিজে ব্যবসা করলে যেই আয় করত তার সমপরিমাণ পারিশ্রমিক চাইত। এই কাজ করলে নয়নতারার লাভ কমে শূন্য হয়ে যেত, কারণ কোন ব্যবসার শ্রমিকরা যদি মালিক হওয়ার সমান পারিশ্রমিক দাবি করে, মূল পুঁজির মালিক ভাড়ার অধিক কিছু পায় না।

কেবল তাঁত নয়, চিকিৎসা, মার্কেটিং, রন্ধন, আই-টি থেকে শুরু করে সব ব্যবসাতেই এমনটি হয়ে থাকে। কারণ সবাই সব কাজে পারদর্শী নয় এবং যে যেই কাজে পারদর্শী সে তার যোগ্যতার সর্বোচ্চ মূল্য পেতে নিজে ব্যবসা শুরু করে দেয়। ব্যবসা করে সকল সম্পদ অর্জনের পথে আরেকটি বাধা হচ্ছে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কোম্পানি এবং ব্যক্তির জন্ম হচ্ছে। তাই প্রতিযোগিতার বাজারে সর্বদা নেতৃত্বস্থান ধরে রাখা যায় না। নতুনরা এসে পুরনোদের জায়গা দখল করে নেয়। এভাবে ব্যবসায় উত্থান পতন চলতে থাকে।

মূল্যস্ফীতি

একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। ব্যবসা প্রক্রিয়াতে মুদ্রা কারো হাতে কুক্ষিগত থাকে না। বরং বিনিয়োগের দ্বারা মুদ্রা বার বার বাজারে ফিরে আসে। আরেকটি বিষয় হল উৎপাদনমুখী ব্যবসার কল্যাণে রাষ্ট্রের মোট উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যের দাম ক্রমশ হ্রাস পায়।

রূপসাগরের কথাই যদি ধরি, নতুন নৌকা তৈরির ফলে যে সব জায়গায় পূর্বে মাছ ধরা সম্ভব ছিল না এখন সেই সব জায়গায় মাছ ধরা সম্ভব হয়েছে। ফলে আগে যেখানে দিনে ১০ সের মাছ ধরা পড়ত এখন সেখানে ধরা পড়ছে ১ মণ। পূর্বের তুলনায় পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দুধ এবং মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া পশু দিয়ে হালচাষ এবং ফসল মাড়াইয়ের কাজ করানোর ফলে ফসলের উৎপাদনও সহজ হয়ে গেছে। এভাবে ব্যবসার ফলে দ্বীপের জিডিপি বা মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যবসা দ্বারা দ্বীপে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা পূর্বের বেকাররাও উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এভাবে রূপসাগরের মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটেছে। সব মিলিয়ে ব্যবসা একটি দেশের মোট সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি করছে।

দ্বীপে যদি নতুন কোনো মোহর সৃষ্টি বা ধ্বংস না হয়, সর্বদা এক জায়গায় স্থির থাকে, তাহলে ব্যবসা উদ্যোগের ফলে কী পরিবর্তন আসবে?

উত্তর হচ্ছে সবকিছুর মূল্য কমে যেতে শুরু করবে। এমনকি ব্যবসার সাথে সম্পর্ক নেই এমন সকল পণ্য এবং সেবার মূল্যও কমে যেতে শুরু করবে। কারণটা এরূপ– রূপসাগরে যদি পূর্বে ২০জন শ্রমিক কাজ করতো, এখন সেখানে কাজ করছে ২৫ জন শ্রমিক। অথচ বাজারে নতুন কোনো

মোহর প্রবেশ করেনি অর্থাৎ, আগের ২০ জনের বেতন এখন ২৫ জনের মাঝে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে কর্মচারীদের গড় বেতন হ্রাস পাবে। দ্বীপের সবার সাথে সাথে নয়নতারার আয়ও কমে যাবে। কারণ, যেসব পণ্য অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে বাজারে সেগুলোর মূল্য কমে আসবে। এমনকি যেসব পণ্য নয়নতারা উৎপাদন করেন না (যেমন- পোশাক) সেসব পণ্যের মূল্যও হ্রাস পাবে এবং সবাই অনেক কম খরচে জীবনযাপন করতে পারবে।

মূল্যহ্রাস কেবলমাত্র একটি মুদ্রাগত পরিবর্তন (ঋণগ্রস্ত হলে ভিন্ন কথা)। মূল্যহ্রাস হলে সবাই যেহেতু কম খরচে জীবনযাপন করতে পারবে, অধিক পারিশ্রমিক না পাওয়ায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং 'পূর্বের তুলনায় মুদ্রাধারীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে'। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

মনে করুন নির্জন পর্ণকুটিরে বসবাসরত বৃদ্ধা শিউলির মায়ের কাছে ৬টি মুদ্রা সঞ্চিত আছে। অনেক দিন পর পর শিউলির মা একবার বাজারে যান। নতুন নতুন ব্যবসা উদ্যোগ শুরু হওয়ার পর শিউলির মা যত বার বাজারে যাচ্ছেন, তত বার তিনি আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ জিনিস কিনতে পারছেন। কারণ অধিক পরিমাণে মাছ, দুধ এবং মাংস উৎপাদিত হওয়ায় এগুলোর দাম কমে গেছে বা মুদ্রাতে বাড়তি ভ্যালু যোগ হচ্ছে। আচ্ছা এই যে, শিউলি মার মুদ্রাতে বাড়তি মূল্য প্রবেশ করল তা কিভাবে সম্ভব হল? এমনটি সম্ভব হয়েছে একারণে যে একটি দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি হলে সেই দেশের সীমিত মুদ্রা আগের তুলনায় আরও মূল্যবান হয়ে যায়। এমনকি যেই ব্যক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত নন তিনিও এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পান। যেমন শিউলির মা কোনোপ্রকার উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিল না এবং নাইও। তারপরেও শিউলির মা উৎপাদনমুখী ব্যবসা দ্বারা লাভবান হয়েছে। আপনি বিষয়টি এভাবেও চিন্তা করে দেখতে পারেন। আপনি গত বছর মাটির নিচে এক কলস টাকা পুঁতে রেখেছেন। গত বছর কলসে যে পরিমাণ টাকা ছিলো এখনও ঠিক সেই পরিমাণই আছে, কিন্তু গ্রামে গত বছর দুধ উৎপাদন হয়েছিল ৫০ কেজি আর এই বছর উৎপাদন হয়েছে ১০০ কেজি। সবকিছু আগের মতো থাকলে দুধের দাম কমে যাবে। এভাবে পুরো অর্থনীতিতে মোট উৎপাদন বেড়ে গেলে, দেখা যাবে সব কিছুর দাম কমে যাচ্ছে। আপনি যদি মাটির নিচে পুঁতে থাকা কলস থেকে তুলে টাকা ব্যয় করেন, আপনি আগের তুলনায় বেশি পণ্য ও সেবা কিনতে পারবেন। এভাবে কিছু না করেও আপনি উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা লাভবান হবেন। শুধু আপনি একা না, সমাজের সবাই কম বেশি এভাবে লাভবান

হবেন। সব মিলিয়ে উৎপাদনমুখী ব্যবসা একটি দেশে মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং নতুন সৃষ্ট সম্পদের মূল্যমান মুদ্রাতেও প্রবেশ করে। সেকারণেই মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পায় বা সব কিছুর দাম কমে যায় এবং সমাজের সবাই উপকৃত হয়।

যত উৎপাদন তত কেন মূল্যস্ফীতি

উপরের তত্ত্বগুলো একদিক থেকে আমাদের চোখে দেখা বাস্তবতার সাথে মিলছে না। আমরা প্রতিনিয়ত দেখি একটি দেশের জিডিপি যত বৃদ্ধি পায়, তার সাথে পাল্লা দিয়ে সব জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যায়। মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে সবার হাতে হাতে টাকা চলে আসে। তখন বাজারে সবকিছুর চাহিদা থাকে বেশি। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ীরাও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দেন। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া, পরিবহন খরচ, পড়াশোনার খরচ সবকিছুর খরচ বেড়ে যায় এবং সমগ্র অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশন দেখা দেয়। উপরের কথাগুলো সেই তুলনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ না।

এই অসামঞ্জস্যতা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি উদাহরণ টেনে আনি। মনে করি, ঘূর্ণিঝড় এসে রূপসাগরকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। দ্বীপের সব গাছপালা, ঘরবাড়ি, ফসলি জমিসহ সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করল, কেবলমাত্র সোনার মোহর বা কড়িগুলো ছাড়া। মুদ্রাগুলো ঠিক আগের মতোই সম্পূর্ণ অক্ষত রয়ে গেল। এর ফলে পণ্যমূল্যে কী প্রভাব পড়বে?

উত্তর হচ্ছে সবকিছুর মূল্য বেড়ে যাবে। এখন সবার হাতেই পূর্বের ন্যায় মুদ্রা থাকবে কিন্তু সেই তুলনায় সম্পদের পরিমাণ হবে সীমিত। এই সীমিত সম্পদের পেছনে অধিক সংখ্যক মুদ্রা ছোটাছুটি করাতে সমগ্র অর্থনীতিতে সবকিছুর দাম বেড়ে মূল্যস্ফীতি দেখা দিবে। আচ্ছা, এমন যদি হতো যে একজন তাঁতির তাঁত বা তুলা কিছুই নষ্ট হয়নি, সেক্ষেত্রেও কি কাপড়ের দামও বেড়ে যেত? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, সেক্ষেত্রেও কাপড়ের মূল্য বেড়ে যেত, কারণ মানুষ টাকা খেয়ে বাঁচতে পারে না বা টাকার ঘরে শুয়ে ঘুম যেতে পারে না। একজন তাঁতিকেও খাবার কিনে খেতে হয় এবং ঘর তৈরি করে থাকতে হয়। সব পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়ে গেলে, তাঁতিকেও কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি করতে হতো। অন্যথায় সে নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারতো না। এভাবে দ্বীপে একত্রে সব কিছুর দাম বেড়ে যেত, অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে

মূল্যস্ফীতি। অর্থাৎ, 'কোনো অর্থনীতিতে মোট সম্পদের পরিমাণ কমে গেলে কিন্তু মুদ্রার সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলে সবকিছুর মূল্য বেড়ে যায়।'

এবার ধরি, দ্বীপে সবকিছু আগের মতোই আছে। কেবল কোনো অশুভ শক্তির প্রভাবে যার যার মুদ্রা অর্ধেক উধাও হয়ে গেছে। তাতে কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সব কিছুর দাম গড়পড়তা অর্ধেক হয়ে যাবে। এতে কেউ দরিদ্র হয়ে যাবে না। যার যার অবস্থা সম্পূর্ণ আগের মতই থাকবে।

এবারে আরেকটি প্রশ্ন উপস্থাপন করি। রূপসাগরের জনসংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মোট উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বীপে নতুন নতুন বন জঙ্গল সাফ করে এখন কৃষিকাজ করা হচ্ছে, পশুপালন করা হচ্ছে, পোশাক তৈরি করা হচ্ছে, কিন্তু মুদ্রার সংখ্যা সেই আগের সমানই আছে। এর ফলাফল কি হবে?

উপরের সূত্র মোতাবেক আমরা বলতে পারি 'মোট সম্পদের পরিমাণ বেড়ে গেলে কিন্তু মুদ্রার সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলে সবকিছুর মূল্য কমে যাবে।'

সেইমতে আমাদের দেশেও উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রতিনিয়ত পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন?

বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হচ্ছে জিডিপি র তুলনায় টাকার পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এমন হয় যে কোন দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ শতাংশ কিন্ত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ শতাংশ, সেই দেশে প্রায় ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশন বজায় থাকবে। আমাদের দেশের অর্থনীতিতে প্রতি বছর টাকার পরিমাণ জিডিপির তুলনায় আরও বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেকারণেই জিডিপি ক্রমবর্ধমান থাকা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি অব্যহত আছে। অর্থাৎ, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীরা দায়ী না, বরং মুদ্রাস্ফীতির কারণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন ব্যবসায়ীরা। তাছাড়া অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, যোগাযোগের সমস্যার কারণে, কিংবা সম্পদের স্বল্পতার কারণে পণ্যমূল্য সাময়িক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এটি একটি সাময়িক এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া।[৫]

৫ গুদামজাত করে বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ব্যবসা প্রক্রিয়াতেও পণ্যমূল্য সাময়িক বৃদ্ধি করা সম্ভব। এমন অসংখ্য অসাধু উপায় আছে। তবে সব মিলিয়ে মুদ্রাস্ফীতিই এই ব্যাপারে সবার চেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে।

এই ব্যাপারে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান বলেছেন,

'Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output.'

– Milton Friedman

American Economist and Statistician, Received Nobel Prize in 1976

'সবসময় এবং সব জায়গায় মূল্যস্ফীতি একটি মুদ্রাজনিত কারবার, কারণ মোট উৎপাদনের তুলনায় মোট মুদ্রার পরিমাণ বেশি বৃদ্ধি করলেই মূল্যস্ফীতি হয়।

– মিল্টন ফ্রিডম্যান

অর্থনীতিবিদ (নোবেল পুরস্কার– ১৯৭৬)

প্রশ্নোত্তর

রূপসাগরের সেরা (একমাত্র) বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অপরূপ বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব রিবা অডিটোরিয়ামে একটা সেশন চলছে। সেশনে বক্তব্য রাখছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জনাব মোমেন পায়ারি। (পাহাড়ি না, মুদ্রণে ভুল নাই)

প্রশ্ন ০১ : সেবা প্রশ্ন করেছেন, 'একজন ব্যক্তির নিকট খুব ভালো একটি ব্যবসায়ী উদ্যোগ আছে। তবে তার হাতে বিনিয়োগ করার মতো যথেষ্ট টাকা নেই। তার জন্য সুদে ঋণ নিলে ক্ষতি কি?

যদি ব্যবসায় লাভ হয় ১৫% কিন্তু বাজারে সুদের হার চলে ১০%। তাহলে অবশ্যই ঋণ নিয়ে তা সুদে আসলে পরিশোধ করা সম্ভব। এই কথা অনস্বীকার্য যে, ঋণ না নিয়ে তিনি যদি নিজের পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করতে পারতেন অথবা কেউ তাকে বিনা সুদে ঋণ দিত, তাহলে খুবই ভাল হত। কিন্তু ধার দেবার মত তার কোনো বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন নেই। সেক্ষেত্রে ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে যদি তিনি একটি সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয়। এই ব্যবসার কল্যাণে একজন বেকার ব্যক্তি সফল ব্যবসায়ীতে রূপে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পাশাপাশি সমাজের অপর কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারবেন। সব মিলিয়ে এই ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলেই তো সমাজ এবং রাষ্ট্র সব দিক থেকে বঞ্চিত হতো।

তাহলে সুদ কি সমাজের কোনো ক্ষতি করলো নাকি উপকার করলো?'

উত্তর : মোমেন পায়ারি, 'ব্যবসা করা অর্থনীতির জন্য উত্তম, কিন্তু ব্যবসায় নামতে গিয়ে এমন কিছু যদি আমরা করি যার ফলে সমাজের সবার মুদ্রা একজনের হাতে চলে যাওয়ার দরজা খুলে যায়, তাহলে সেটা আমাদের করা উচিত না। সুদকে আমরা এজন্যই এড়িয়ে চলবো যাতে আমরা নিজের উন্নতি করতে গিয়ে সবার ক্ষতি করে না বসি।'

প্রশ্ন ০২ : রাজা মিয়া, 'কিন্তু জনাব, এই বিষয়টি পরিষ্কার করা উচিত যে আলোচ্য ব্যবসায়ীর পক্ষে সুদে ঋণ না পেলে ব্যবসার মূলধনই জোগাড় করাই সম্ভব হত না। সেক্ষেত্রে, গ্রাহক এবং ব্যাংক নিজেরাই নিজেদের মধ্যে স্বেচ্ছায় সুদের চুক্তি করলে তারা অন্য কারো ক্ষতি করছে কি? এটা তো তাদের ব্যক্তিগত লেনদেন।

আমার কথা হচ্ছে ব্যাংক থাকলে থাকুক। সমাজে যার প্রয়োজন সে ঋণ নিবে আবার যার প্রয়োজন নেই সে ঋণ নেওয়া থেকে দূরে থাকবে। সুদ উচ্ছেদ করে দেবার কিংবা সুদী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘৃণা করার যুক্তি কোথায়?'

উত্তর : মোমেন পায়ারি (মনে মনে ভাবলেন, এতক্ষণ কি বুঝাইলাম!), 'দেখুন, যিনি ব্যবসা করতে চান, কিন্তু তার মূলধন নেই, আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, সুদে ঋণ না নিলে সে ব্যর্থ। কিন্তু, আসলে যে কেউ সুদে ঋণ নিলেই সমাজের সবার উপরে চাপ পড়ে। একটি নির্দিষ্ট সীমার পরে সবার পক্ষে সব ঋণের টাকা সময়মত ফেরত দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে, তৈরি হয় ঋণখেলাপি ও অন্যান্য জটিলতা। অথচ, বৈধ ব্যবসায় যুক্তিপূর্ণ অংশিদারিত্ব ও সুদমুক্ত ঋণে সহমর্মিতা থাকায়, যিনি আজকে মূলধন জোগাড় করতে পারছেন না কিংবা ঋণশোধ করতে পারছেন না কিংবা ব্যবসাতে লস করেছেন, তাদের সবার অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং লাভগুলোও কমবেশি সবাই ভোগ করে।

কিন্তু সুদী সিস্টেমের আগাগোড়া পুরোটাতেই মূলত সুদে জড়িত ব্যক্তিদের লাভ হয়। আর বাকি সবাই দীর্ঘমেয়াদে হন ক্ষতিগ্রস্থ।

এই যুক্তিগুলো বিশ্লেষণ করতে সুক্ষ্মদৃষ্টি বজায় রাখা এবং একই সময়ে সংকীর্ণতা পরিহার করা গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ নেবার ফলে যে ব্যবসা ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং গ্রহীতাকে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তা আমাদের সবার জানা। কিন্তু আলোচ্য বিষয় সেইটা না। প্রশ্ন হচ্ছে সুদে ঋণ নিয়ে ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব কিনা? যদি কষ্টকর কিছুর বিনিময়ে সমাজ সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়, তাহলে আমরা এই কষ্টকর অধ্যায় সমাজ থেকে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি না। এর একটি উত্তম উদাহরণ হচ্ছে অপরাধীর

শাস্তির বিধান। যদিও শাস্তি অপরাধীর এবং তার পরিবারের জন্য খুবই বেদনাদায়ক, তা সত্ত্বেও সমাজ বলপূর্বক অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে থাকে। কারণ একজনের কষ্টের বিনিময়ে সমাজের বেশির ভাগ সদস্যের উপকার হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতের জন্যও দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি সুদ না নিয়ে একজন ব্যবসায়ী মানসিক ও আর্থিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গিয়েও যদি সমাজকে ভালো কিছু উপহার দিতে পারেন, তাহলে সুদ সমাজে থাকা উচিত।

অপরদিকে, যদি কোনো ব্যক্তি ঋণ নিয়ে সফল ব্যবসায়ীতে পরিণত হন, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ যেকোনো অপরাধই অপরাধীকে লাভবান করে থাকে। দুইজন ব্যক্তি যখন ঘুষ আদান প্রদান করে তখন তারা উভয়ই লাভবান হয়ে থাকেন। ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি সুদে ঋণ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি সুদে ঋণ প্রদান করে এবং যে ব্যক্তি এর দলিল লিখে রাখে তাদের প্রত্যেকেই লাভবান হচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সমাজ কি লাভবান হচ্ছে? ভালো ও মন্দ বিচার সেই কষ্ঠিপাথরে নিরূপণ করতে হবে। সমাজ যদি সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, সুদ আর ব্যক্তিগত বিষয় রইল না। অন্য সব অপরাধের মত এটাও তখন একটাও অপরাধ।'

অডিটোরিয়ামে করতালির চোটে টেকা যাচ্ছে না আর রাজা ভাইকে বাড়ির পথ ধরতে দেখা গেল। আজকে জনাব রিবা বেঁচে থাকলে খুব কষ্ট পেতেন, তার নামাঙ্কিত অডিটোরিয়ামেই 'সুদ'এর বিরুদ্ধে বাণী, আহা!

প্রশ্ন ০৩ : জনাব নাদান, 'আচ্ছা, ধরি ইউরোপ নামের একটা মহাদেশ আছে, সেখানে রূপসাগরের থেকেও বড় বড় দেশ আছে। সেই বৃহৎ রাষ্ট্রে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংক থাকে। আমাদের মত এরকম রিবা ভাইয়ের একক ব্যক্তিগত ব্যবসা থাকে না, সেক্ষেত্রে কি ফলাফল হবে?'

উত্তর : মোমেন পায়ারি, 'আপনি এক ফোঁড়ার জ্বালাতেই বাঁচেন না, আবার ছোট ছোট ফোঁড়া সারা গায়ে, বলেন কি?!' অডিটোরিয়ামে হাসির রোল পড়ে গেলেও তিনি বলে চললেন, 'সেই ক্ষেত্রে একটি ব্যাংক নয় বরং ব্যাংক ব্যবস্থা একত্রে সব মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আরো গতিময়তার সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করবে।'

প্রশ্ন ০৪ : পণ্ডিত মশাই, 'অর্থনীতির পুস্তকসমূহে অনেক সময় উল্লেখ করা হয় যে সমাজে কিছু মানুষের হাতে অলস টাকা জমা পড়ে থাকে আবার কিছু মানুষের জীবনে টাকার খুব প্রয়োজন। এই দুই শ্রেণির মধ্যে মধ্যস্ততা করে দিচ্ছে ব্যাংক। যা একটি মহান উদ্যোগ। ব্যাংক সুদ গ্রহণ করে সত্য

কিন্তু লাভ ছাড়া একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কেন টাকা ধার দিবে? তাছাড়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার ও পরিচালনার খরচ তো আছেই এবং গ্রাহকের দেউলিয়া হবার ঝুঁকিও ব্যাংক নিচ্ছে। তাহলে, কেন তাদের এত চমৎকার অবদানকে আমরা খাটো করব?'

উত্তর: মোমেন পায়ারি, 'আপনার কথাগুলো ঠিক। কিন্তু সুদ কেবলমাত্র ব্যাংক এবং গ্রাহকের ব্যক্তিগত লেনদেন না। সুদের প্রভাব সম্পূর্ণ সমাজে ক্যান্সারের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং গুটিকতক মানুষ সাময়িক লাভবান হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দ্বারা এবং মুদ্রাপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণের ফলে সমাজ সামগ্রিক ভাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সমাজে যাদের হাতে বাড়তি মুদ্রা আছে এবং যাদের হাতে কম আছে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত জরুরি। এই মহৎ কাজটি সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া কিভাবে আমরা সাধন করতে পারি, সেটার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা ইসলামে আছে। তা হচ্ছে সুদমুক্ত ঋণের লেনদেন এবং ব্যবসা বিনিয়োগের মাধ্যমে ফাইনান্সিং। আল্লাহ চাইলে এগুলো নিয়ে পরবর্তী বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা রাখব।'

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাংক এবং দেউলিয়াত্ব

এই পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি সুদ এবং ব্যবসার পার্থক্য কি, কিভাবে সুদের চক্র দ্বারা সব মুদ্রা সুদী ব্যক্তির হয়ে যায়, ব্যবসার সাথে অর্থনীতি ও মুদ্রাব্যবস্থার সম্পর্ক কি ইত্যাদি। কিন্তু সব মুদ্রা সুদী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে আসার পরও যদি সুদের চাকা ঘুরতে থাকে তখন যাত্রীদের গন্তব্য কোথায় হবে? সেই প্রশ্নটির উত্তরই এবার জানব।

ধরি, রূপসাগরের অর্থনীতি আরও অনেক বড় হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে ব্যবসা কার্যক্রমও বড় হয়েছে। রিবা পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সদস্য 'আমোদ' রূপসাগরের প্রথম ব্যাংক, 'রামিম'[৬] ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেছে।

রূপসাগরের সুদের সেই গদির উত্তরাধিকারী হওয়ায় রামিম ব্যাংকের (বা আমোদ-এর) হাতেই এখন সমস্ত মুদ্রা মালিকানা। তবে সব মুদ্রা রামিম ব্যাংকের অধীনে আসাতে সমগ্র অর্থনীতি থমকে যায় নাই, বরং আগের নিয়মেই সকল কেনাবেচা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি এবং কৃষিকাজ চলছে। কিন্তু মুদ্রা বলতে যা বোঝায় তা রামিম ব্যাংকের কাছ থেকেই ঋণ আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করবে। এই ঋণ পাবার জন্য সকল অধিবাসীকে ব্যক্তিগত ভাবে আলাদা আলাদা করে রামিম ব্যাংকের কাছে আসতে হবে না। পাইকারি বিক্রেতাদের থেকে খুচরা বাজার হয়ে যেমন সবার কাছে পণ্য পৌঁছে যায়, ঠিক তেমনি গুটিকয়েক মুষ্ঠিমেয় ব্যক্তি ঋণ নিলেই তাদের মাধ্যমে দ্বীপে সবার হাতে মুদ্রা ছড়িয়ে পড়বে। কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারবে না কি হচ্ছে।

যেমন একজন ব্যবসায়ী সুদে ঋণ নেওয়ার পরে যখন কেনাকাটা করবেন বা কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দিবেন তখন ঋণের মুদ্রা তার হাত থেকে অন্যদের

৬ আরবি রামিম শব্দের বাংলা অর্থ 'ধ্বংসপ্রাপ্ত'

হাতে চলে যাবে। শ্রমিক কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সেই মুদ্রাগুলো যখন নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করবে তখন সেগুলো ধীরে ধীরে সবার হাতে ছড়িয়ে পড়বে। এভাবে একটি অর্থনীতিতে সবগুলো মুদ্রা ঋণের আকারে প্রবেশ করলেও সাধারণ চোখে তা ধরা পড়বে না। একজন ব্যবসায়ীর কথাই চিন্তা করুন, তিনি ১০০টি কড়ি ঋণ নিয়ে মনে করি তার কারখানার শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি প্রদান করলেন। কিছুদিন বাদে তারা বাজারে কেনাকাটা করতে গেল। তখন তারা একজন কৃষকের কাছ থেকে ৫ কড়ির চাল কিনলে হাতে আসার পর সেই কৃষক মনে করবে এই ৫টি কড়ি সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত। আসলেইতো, এত কষ্টের কামাইতো তো ঋণের টাকা না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যবসায়ী এই কড়ি ঋণ আকারে গ্রহণ করছিলেন এবং পরবর্তীকালে তা ঘুরে ফিরে কৃষকের হাতে এসে পৌঁছেছে।

এভাবে সকল মুদ্রার মালিক ব্যাংক হয়ে থাকলে প্রতিনিয়ত কিছু ব্যক্তি রামিম ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিবে এবং তা বাজারে ঘুরেফিরে বেড়াবে। রূপসাগরের সব মুদ্রার মালিক রামিম ব্যাংক হয়ে থাকলেও কেউ ঘুণাক্ষরেও মূল রহস্য টের পাবে না। সবাই মনে করবে, হাতের কড়ির মালিকানা তাদের। কিন্তু বাস্তবে সব কড়ির মালিক 'ব্যংক' কেবলমাত্র কড়ি ভাড়া দিচ্ছে। সেই ভাড়ার কড়িতেই বেচাকেনা, সঞ্চয় সবকিছু চলছে। এরূপ একটি অর্থনীতিতে কোনো কানাকড়িও 'সুদ-মুক্ত' না।

সুচিন্তিত পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন, সব কড়িই যদি ঋণ আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে, সুদ পূরণ হবে কোথা থেকে?

দ্রুত একটি হিসেব কষে নেই। বর্তমানে রূপসাগরে মোট ২০,০০০টি কড়ি আছে। এই সবগুলো কড়িই রামিম ব্যাংকের। বাজারে সুদের হার ১০% হলে পরের বছর ব্যাংক ২২,০০০টি কড়ি ফেরত চাইছে। কিন্তু দ্বীপে আছেই কেবল ২০,০০০টি কড়ি। কড়ি যেহেতু ডিম পাড়ে না এই ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব। অর্থাৎ, এমন একটি সমাজের কিছু সংখ্যক গ্রাহকের জন্য ঋণ খেলাপি হওয়া গাণিতিকভাবে আবশ্যক। কথাটি একদম সত্য।

এতক্ষণ পর্যন্ত ঋণী ব্যক্তির জন্য দেউলিয়া হওয়া 'বাধ্যতামূলক' ছিল না। কিন্তু এই পর্যায়ে শতকরা দশ শতাংশ গ্রাহক ঋণ খেলাপি হতে বাধ্য থাকবেন। সুদের হার দশ শতাংশ হলে গড়ে দশ শতাংশ গ্রাহকের জন্য দেউলিয়া হওয়া আবশ্যক। আবার সুদের হার বিশ শতাংশ হলে গড়ে বিশ শতাংশ গ্রাহকের জন্য দেউলিয়া হওয়া আবশ্যক।

যদিও ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে ঋণখেলাপি ব্যক্তি অযোগ্য এবং ঠগ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, সামান্য কিছু সংখ্যক অসৎ ব্যক্তি বাদে অন্য সব ঋণ খেলাপি কার্যত অপরাধী নয়। তারা মূলত সিস্টেমের শিকার। কারণ, একজন ব্যক্তির দ্বারা নতুন টাকা ছাপানো যেমন অসম্ভব। ঠিক তেমনি, একটি সমাজে কিছু সংখ্যক গ্রাহকের জন্য ঋণখেলাপি না হওয়াটা একেবারেই অসম্ভব।

জনাব রিবা, রাজা কিংবা আমোদ এতক্ষণ পর্যন্ত সম্পত্তি বলতে কেবল কড়ি অর্জন করেছিল। কিন্তু অর্থনীতির সব কড়িই যখন ব্যাংকের হতে চলে আসলো তখন থেকে স্থায়ী সম্পত্তিও রামিম ব্যাংকের হাতে আসা শুরু করলো। সমীকরণটি অনেকটা এমন– রামিম ব্যাংক এই বছর সমাজের সকলকে ২০,০০০টি কড়ি ঋণ দিয়ে পরের বছর ২২,০০০টি কড়ি ফেরত চাইছে। সাগর থেকে যেহেতু ভেসে আসা কড়ির সংখ্যা বছরে ১০০টি। তাই আগামী বছর সবাই মিলে ২০,১০০টি কড়ি এবং ১,৯০০টি কড়ির সমপরিমাণ সম্পত্তি ফেরত দিচ্ছে। ব্যাংক চাইলে এই সম্পত্তি নিজের কব্জায় তালাবদ্ধ রেখে দিতে পারে অথবা বাজার দরে বিক্রি করে দিতে পারে। যেটাই করুক না কেন, ঋণ দেওয়া মুদ্রার পরিমাণ যেহেতু মোট ফেরত চাওয়া মুদ্রার চেয়ে কম, প্রতি বছর কিছু ব্যক্তি দেউলিয়া হতে থাকবে, আর দেউলিয়া ব্যক্তিদের সম্পত্তি চুম্বকের মতো ব্যাংকের হাতে আসতে থাকবে। যেহেতু কড়ি (টাকা) ছাড়া মানুষ চলতে পারে না এই চক্র থেকে বের হবার কোনো উপায় নেই (সম্পূর্ণ মুদ্রা ব্যবস্থা পরিবর্তন করা ছাড়া)। যতদিন পর্যন্ত কড়ির লেনদেন বাজারে চালু থাকবে, ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী সম্পত্তি চুম্বকের মতো ব্যাংকের নিকট চলে যেতে থাকবে। এভাবে ব্যাংকের সম্পত্তি কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর এই বৃদ্ধির হার সুদের হারের সমানুপাতিক।

একটা চিন্তার টোটকা দেই

monopoly খেলা

কখনো মনোপলি খেলেছেন? খেলাটাতে টাকার পরিমাণ বাড়ে না। জমি, বাড়ি, হোটেল ও অন্যান্য সুবিধাও একেবারে সীমিত। তাহলে একজন খেলোয়াড় সব সম্পত্তির মালিক হওয়ার মাধ্যমে জিতে যায় কিভাবে? অন্য খেলোয়াড়দের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। সুদী সমাজের বাস্তবটাও ঠিক এমনই।

'When plunder becomes a way of life for a group of men in a society, over the course of time they create for themselves a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it.'

Claude-Frédéric Bastiat
French Economist, Writer & member of the French National Assembly
(1801 - 1850)

'লুটপাট করা যখন একদল মানুষের জীবিকার মাধ্যম হয়ে যায়, তারা সেটাকে বৈধ করার জন্য আইন বানিয়ে ফেলে এবং এমন একটি নৈতিকতার মানদণ্ড দাঁড়া করায় যা তাদের কাজকে খুব ভাল বলে প্রচার করে।'

– ফ্রেডেরিক বাসতিতাত
ফ্রেঞ্চ অর্থনীতিবিদ, লেখক ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য (১৮০১-১৮৫০)

ভেলার ভেলকি

মনে করি পয়সাবিহীন একটি সমাজে 'ভেলা' নামের একটা ক্ষুদ্র-ঋণ সংস্থা প্রত্যেক পরিবারকে ১০টি পয়সা ঋণ দিয়ে বছরান্তে ১১টি পয়সা ফেরত চাইল। ঋণে পাওয়া পয়সা ছাড়া ওই দরিদ্র সমাজে আর কোনো পয়সা নাই।

ভেলা যদি মোট একশটি পরিবারকে ক্ষুদ্র-ঋণ দিয়ে থাকে তাহলে ভেলা মোট পয়সা দিয়েছে ১,০০০টি। এখন, মোট ১,১০০ পয়সা ফেরত চাওয়াটা কি যৌক্তিক? নিশ্চয়ই না, কারণ পরিবার প্রতি গড়ে ১০টি পয়সা আছে, ১১ পয়সা দিবে কোথা থেকে। ঋণ নেবার পরেই সুদের পয়সা সংগ্রহ করতে তাই পরিবারগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করা শুরু করে দিবে (মারামারি করাটাও অস্বাভাবিক নয়)। এভাবে সর্বোচ্চ ৯০টি পরিবার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবে। তারা সবাই মিলে দিবে ৯৯০ পয়সা সর্বোচ্চ। বাকি ১১০ পয়সার জন্য ঋণগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত সম্পদ জব্দ করে 'ভেলা'র নামে লিখে দেওয়া হবে।

এমন একটি সিস্টেম তৈরি করা মানেই হচ্ছে ঋণদাতা সম্পত্তি অর্জনের মেশিন হাতে পেল। সে যে বুদ্ধির জোরে ব্যবসা করে সম্পত্তি অর্জন করছে তা নয় বরং একটি ফাঁকফোকর বিহীন জুলুমের মেশিন তৈরি করেছে যা সবার সম্পত্তি নিশ্চিত রূপে তার হাতে তুলে দিবে। এখন কিছু দক্ষ ব্যক্তিকে বেতন দিয়ে মেশিন চালানোয় নিয়োজিত করলেই ব্যস নিশ্চিন্ত, মালিক হিসেবে আর কোনো কাজ বা দায়িত্ব বলে আর কিছুই নেই, মেধা খরচ করারও কোনো প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র এই মেশিন সমাজে ধরে রাখতে পারলেই হলো।

ভাবুনতো, দেশসেরা মেধাবীরা তাদের সমস্ত মেধা নিংড়ে ব্যাংকে কাজ করে কি শুধুই নিজেদের ক্যারিয়ার করছে এবং পাশাপাশি সমাজের উপকার করছে? নাকি তাদের আশেপাশের সবকিছুর পতন ও জুলুম ত্বরান্বিত করছে?

চক্রাকার ঋণ এবং সুদ

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিয়েছি মহাজন (বা ব্যাংক) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দিয়ে কিছুদিন পরে সবার থেকে তা সুদে আসলে ফেরত নিবে।

আমরা মোট দুটি সরলীকরণের শর্ত জুড়ে দিয়েছিলাম–

১. সবাই একসাথে ঋণ নিবে।
২. সবাই একসাথে সুদে আসলে সেই ঋণ ফেরত দিবে।

প্রকৃতপক্ষে, ব্যাংক সব ঋণ একসাথে দেয় না। আবার সব ঋণ একসাথে ফেরতও নেয় না। এক এক দিন, এক এক জন গ্রাহক ব্যাংকের সাথে এক এক রকম লেনদেন করে যায়। এই দেওয়া নেওয়া কার্যক্রম কুমোরের চাকার মত ঘুরে ঘুরে চলতে থাকে, এবং সময়ের সাথে চাকার আকৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে সব মুদ্রা ঋণ হয়ে গেলে আসল ফেরত দেওয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে। কারণ আসলের সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে একরকম ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার শামিল। কিন্তু, সবাই যদি ঋণ ধরে রেখে কেবল সুদ প্রদান করে যায় যেমনটা আমরা বর্তমান বিশ্বে দেখি, সেক্ষেত্রে কি মুদ্রাব্যবস্থা ও মানুষের জীবনে ভারসাম্য রক্ষা পাবে?

সুদরূপী অ্যানাকোন্ডা এবং সজীবের পরিণতি

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রথমে আমরা ব্যক্তি জীবনের আয়নায় চক্রবৃদ্ধি সুদের প্রভাব দেখি। মনে করি, সজীব নামের একজন তরুণ ব্যবসায়ী পৈতৃক ভিটে জামানত দেখিয়ে ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করল। তার ব্যবসার রিটার্ন হচ্ছে ২৫% এবং সুদের হার ১৫%। সে মোট ১.২ কোটি টাকা ঋণ নিলে প্রতি মাসে তার লাভ থাকে ২.৫ লক্ষ টাকা এবং সুদ আসে ১.৫ লক্ষ টাকা। প্রতি মাসে সজীবের হাতে 'নীট মুনাফা' থাকে ১ লক্ষ টাকা।

ধরি, নবম বছর ব্যবসায় মন্দা লাগলো এবং সেই বছরে সজীব সুদ প্রদান করতে ব্যর্থ হলো। ব্যাংক পরিচালক তা শুনলে বলবেন, 'কোনো সমস্যা নেই, এই বছর অনেকেই সুদ দিতে পারেন নাই। আপনি কোনো চিন্তা

করবেন না। আমরা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আপনার বিফল হওয়া সুদ দায় হিসেবে যুক্ত করে রাখব। আপনি আপনার সুবিধা মতন সময়ে পরিশোধ করে দিয়েন।'

অর্থাৎ, দশম বছর মোট দায় ১৫% বেড়ে হয়ে যাবে ১.৩৮ কোটি টাকা এবং প্রতি মাসে সুদ আসবে ১.৭২ লক্ষ টাকা। লক্ষ্য করুন, সজীবের লাভ হচ্ছে মাসে ২.৫ লক্ষ টাকা কিন্তু সুদ আসছে মাসে ১.৭২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, সুদ পূরণ করার পরে হাতে থাকছে এখন ৭৮ হাজার টাকা। এক কথায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা ছাড়া আগের মতো সংসার চালানোর কোনো উপায় নাই।

ব্যবসাতে লাভ ক্ষতি আছেই। দেখা গেল ক্ষতি কাটিয়ে আগের অবস্থানে ফিরে আসতে তার মোট দুই বছর লেগে গেল।

আরও দুই বছর সুদ দিতে না পারলে তার মোট ঋণের পরিমাণ ১৫% বেড়ে দশম বছর শেষে দায় হবে ১.৩৮+.২০৭=১.৫৮৭ কোটি টাকা, এবং এগার তম বছর শেষে হবে ১.৫৮৭+.২৩৮=১.৮২৫ কোটি টাকা। এরপর থেকে ব্যবসা স্বাভাবিক রূপে চলতে থাকলে প্রতি মাসে সুদ আসবে ২.২৮ লক্ষ টাকা।

উল্লেখ্য যে ঋণের মোট পরিমাণ বেড়ে গেলে credit rating খারাপ হয়ে সুদের হারও বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। ১৫% এ থাকবে না। হিসেবের সুবিধার জন্য আমরা তা আমলে নিচ্ছি না। তবে এই বিষয়টিও স্মরণে থাকা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক মন্দা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা কারণে ব্যবসায় লোকসান আছেই। প্রতি বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সুদ দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব না। মাঝে মাঝে কিস্তি ছুটে যেতেই পারে। এই উদাহরণে প্রথম ১২ বছরে যেমন তিনটা কিস্তি বিফল হয়েছে, তেমনি করে পরবর্তী ১২ বছরে আরও ৩টি কিস্তি ছুটে যেতে পারে। তখন কি হয় দেখুন।

৪ বার সুদ পরিশোধ না করলে মোট দেনা হবে ২ কোটি টাকা এবং মাসিক সুদ আসবে ২.৬২ লক্ষ টাকা। (পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, নয় দেউলিয়া)

৫ বার সুদ পরিশোধ না করলে মোট দেনা হবে ২.৩ কোটি টাকা এবং মাসিক সুদ আসবে ৩ লক্ষ টাকা।

৬ বার সুদ পরিশোধ না করলে মোট দেনা হবে ২.৬৪৫ কোটি টাকা এবং মাসিক সুদ আসবে ৩.৪৫ লক্ষ টাকা।

বাকি হিসাবগুলো দেখালাম না। ব্যাপক পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সুযোগ না থাকলে সজীব সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে ভিটেমাটিও হারাবে।

আপনারা যদি ভেবে থাকেন, প্রতি বছর নিয়মমাফিক সুদ দিলে সজীবকে তার সজীবতা হারাতে হতো না অর্থাৎ, চক্রবৃদ্ধির ফাঁদে পড়তে হত না, তাহলে আপনাদের জেনে রাখা জরুরি যে কোনো ব্যবসাই চিরকাল লাভ থাকতে পারে না। ব্যবসায় লোকসান আছেই। তাই ঋণের চক্রে পড়লে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেই ব্যাংকের পেটে চলে যেতে হবে।

আমাজন জঙ্গলের অ্যানাকোন্ডা সাপ যদি আপনাকে পেঁচিয়ে ফেলে বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দেয় নিশ্বাস না ফেলে বের হবার চেষ্টা করতে। কারণ আপনি যত বার নিশ্বাস ফেলার জন্য বুক সংকুচিত করবেন, অজগর ততই টাইট করে চেপে ধরবে। ফলে আপনার বুক একেবারে সংকুচিত হয়ে যাবে এবং অক্সিজেনের অভাবে আপনি মারা যাবেন। ঋণ হচ্ছে এমনই একটি ফাঁদ। যতবার আপনি সুদ মিস করবেন ততবার তা আপনাকে চেপে ধরবে।

বর্তমান বিশ্ব এভাবেই চলছে। যখন কোনো কোম্পানি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়, ব্যাংক তাদের ক্রেডিট রেটিং (ঋণ সক্ষমতা) যাচাই করে সেই অনুযায়ী সুদের হার নির্ধারণ করে। একটি কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং ভালো হলে সুদের হার কম রাখা হয়। অপরপক্ষে, ক্রেডিট রেটিং খারাপ হলে সুদের হার বেশি রাখা হয়। ঋণ নেওয়ার পরে কোনো কোম্পানি সুদ প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ঋণের বোঝা বেড়ে যায়। ঋণের বোঝা বেড়ে গেলে ক্রেডিট রেটিংয়ের অবনতি হয় এবং সুদের হার বৃদ্ধি পেয়ে যায়। রেটিং খুব বেশি খারাপ হয়ে গেলে ব্যাংক আর ঋণ নবায়ন করতে রাজি হয় না। তখন একটি কোম্পানি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে।

আপনারা ভাবতেই পারেন, 'একজন ব্যবসায়ীর ঋণ নেওয়ার কি প্রয়োজন? ঋণ নেওয়া ছাড়া ব্যবসা করলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। কেউ তো ঋণ নিতে কাউকে বাধ্য করছে না, ইত্যাদি।' আপনার কথা ঠিক, আবার ভুলও। একটি অর্থনীতিতে যখন 'ঋণ=টাকা' হয়ে যায়, তখন কাউকে না কাউকে ঋণ নিতে হবেই। ঋণ নেই মানে কোনো টাকাও নেই। এমন একটি অর্থনীতিতে ঋণ নেওয়া ছাড়া ব্যবসা করাটা দুঃসাধ্য আর ঋণ মুক্ত হওয়াতো স্বপ্ন।

টিকা - মূলধনের মুলা

বাংলাদেশের একজন শিল্পপতি ঋণ নিয়ে কি করেন? জমি কেনেন, ফ্যাক্টরি বানান, মেশিন আমদানি করেন, লাইসেন্সের জন্য ঘুষ দেন, কাঁচামাল আমদানি করেন। তাহলে, টাকাতো চলে গেল, তিনি যদি গুঁড়ো দুধের

ফ্যাক্টরি করেন, তাহলে গুঁড়ো দুধ বিক্রি করে কত বছর লাগবে তার এই ঋণের টাকা সুদ-আসলে ফেরত দিতে?

শুধু বাংলাদেশ কেন, চীন-জাপান-উগান্ডা-মেক্সিকো সব জায়গার শিল্পপতি ঋণ নিয়ে একই কাজ করেন। হয়ত ১৯-২০ পার্থক্য কিন্তু মূল সুর একই।

আসুন, চট করে একটা হিসাব কষে আসি। ধরি, এই শিল্পপতি ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ নিলেন ১০ বছরের জন্য এবং সরল সুদের হার মাত্র ১০%। অর্থাৎ, প্রতি বছর তাকে সুদ দিতে হবে ১০০ কোটি টাকা এবং ১০ বছর পরে মূল টাকা। এতে করে শিল্পপতিকে সময়-শেষে সুদ-আসলে মোট ফেরত দিতে হবে ২০০০ কোটি টাকা!

এবার ধরি, ১ কেজি গুঁড়ো দুধ তিনি উৎপাদন করেন ৪০০ টাকায় এবং বিক্রি করেন ৫০০ টাকায়। অর্থাৎ, কেজিতে তার লাভ হয় ১০০ টাকা। ব্যবসায়ী যদি নিয়মিত সুদ প্রদান করেন, ১০০ কোটি টাকা তুলতে তার প্রতি বছরে কি পরিমাণ গুঁড়ো দুধ বিক্রি করতে হবে?

১ কোটি কেজি। অর্থাৎ, প্রতি বছর গড়ে বিক্রি করতে হবে ১ কোটি কেজি গুঁড়ো দুধ।

ভাবছেন, বাংলাদেশে ১৭ কোটি মানুষ থাকে, মাত্র ১ কোটি মানুষ ১ কেজি করে কিনলেইতো হয়ে যাবে? বাস্তবে হিসেবটা এত সহজ না। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে গুঁড়ো দুধের আমদানি ছিল ১৪ কোটি ৫০ লাখ কেজি। বাজারের সবগুলো কোম্পনি মিলে এই পরিমাণ বিক্রি করে। সুতরাং একটা নতুন কোম্পানির জন্য দেশে এসেই ১ কোটি কেজি গুঁড়ো দুধ বিক্রি করা সহজ ব্যাপার না।

কিন্তু কোম্পানি কি শুধু সুদের টাকা ফেরত দিতে ব্যবসা করে? মুনাফা করবে না? তাহলে তাকে আরো বেশি গুঁড়ো দুধ বিক্রি করতে হবে। অন্যদিকে ১০ বছর শেষে এই কোম্পানিকে একত্রে পুরো আসল বা ১০০০ কোটি টাকা দিতে হবে, ১০ম বছরের সুদসহ মোট পেমেন্ট হবে ১১০০ কোটি টাকা। তাহলে সেই বছর তাকে বিক্রি করতে হবে ১১ কোটি কেজি গুঁড়ো দুধ! মানে, বাংলাদেশের প্রায় সব গুঁড়ো দুধ তাকেই বেচতে হবে অথবা তার কোম্পানি শেষ!

এটা কি আসলে হয়? না, হয় না। আসলে এই 'শিল্পপতি'রা শিল্পিত উপায়ে সুদ ব্যবহার করেন। তারা কখনোই আসল ফেরত দেন না এবং ব্যাংকাররাও আসল কখনোই ফেরত নিতে চান না! শিল্পপতির জন্য শুধু সুদ

দিয়ে যাওয়া সহজ এবং শিল্পপতিকে সুদের চক্রে আটকে রাখলেই ব্যাংকের লাভ।

তাহলে দেখা গেল, সুদে-আসলে ঋণ ফেরত দিতে গেলে এক রকম ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হবে। সেই তুলনায় কেবল সুদ দিয়ে ঋণের বোঝা টানতে থাকলে এত কষ্ট করতে হচ্ছে না। তাছাড়া সুদে ব্যয় করলে ট্যাক্সও কম দিতে হয়। সব মিলিয়ে ঋণের বোঝা টেনে টেনে ব্যবসা করতে হবে এইটাই নিয়ম হয়ে গেছে। আর সব টাকার মালিক যেখানে ব্যাংক, সেখানে ঋণ ছাড়া টাকাও পাওয়া যাবে না।

এরকম সিস্টেমের কারণেই শিল্পপতিরা প্রতি বছর ঋণ নবায়ন করতে থাকে (একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ সর্বদা সমানতালে বজায় রাখবে) এবং সমান তালে সুদ পরিশোধ করতে থাকে। আসল টাকা সে কোনোকালেই শোধ দিতে যায় না।

জম্বি কোম্পানি

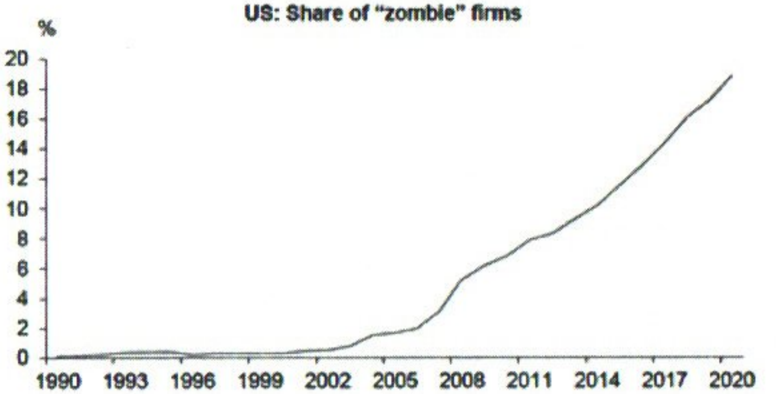
জঙ্গি না, জঙ্গি না, মুদ্রণে ভুল নাই আলহামদুলিল্লাহ...ঠিকই পড়েছেন, 'জম্বি' কোম্পানি! হলিউডের মুভি কিংবা হাল-আমলের বহু গেমস আর ফিকশনের ক্যারেক্টার হচ্ছে 'জম্বি'। মানুষের মত দেখতে এরা, তবে জীবিত থেকেও মৃত। নড়ে-চড়ে, চলা-ফেরা করে কিন্তু তারা সবাই লাশ। কল্পনার এই জম্বি সাধারণত হয় রোগগ্রস্ত, তারা খায় না, ঘুমায় না, নেই কোনো মানবিকতা ও চেতনা। তাহলে, জম্বি কোম্পানি কি?

আমরা যা আলোচনা করছি, এর কোনোটাই শুধু বইয়ের পাতা আর অর্থনীতিবিদদের খাতায় সীমাবদ্ধ তাত্ত্বিক কচকচি না, বরং চূড়ান্ত বাস্তব এবং সুদভিত্তিক আর্থিক সিস্টেমের মূল ভিত্তি। সিস্টেমের প্রতিটা পরতে পরতে আমরা দেখছি কিভাবে সব মুদ্রা ব্যাংকের হাতে চলে যায়, সুদের ঋণ আকারে আবার সেটা অর্থনীতিতে ফেরত আসে, এরপর আবার, প্রতিনিয়ত সে কোম্পানিগুলোকে দেউলিয়া হতে বাধ্য করে এবং কোম্পানিগুলো দেউলিয়াত্ব পিছাতে গিয়ে শুধুই সুদের ঘানি টানার চেষ্টা করে।

এই যে কোম্পানিগুলো এমন 'চমৎকার' ও 'সুচতুর' আইডিয়া বের করল যে সে শুধুই সুদ দিয়ে যাবে আর আসল ফেরত দিবে না, এতে করে কি সে বেঁচে যেতে পারে? দুনিয়াতে নতুন এক ধরনের কোম্পানি পাওয়া যাচ্ছে, যারা তাদের ব্যবসায়ের সব লাভ শুধু সুদ প্রদানেই ব্যয় করে থাকে। অর্থাৎ তারা

তাদের লাভ আর কোনো কাজেই ব্যয় করতে পারে না, শুধুই গুনতে হয় সুদ। এই কোম্পানিগুলো তাদের সব লাভ সুদ প্রদানে ব্যয় করে বেঁচে থাকে। একটি অর্থনৈতিক ঝড় আসলেই এই সব কোম্পানি মারা যাবে। দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে থাকা এই কোম্পানিগুলোকে বলে 'জম্বি কোম্পানি'। অর্থাৎ, জীবন থেকেও মৃত।

নিচের চার্টে লক্ষ্য করুন। আমেরিকার জম্বি কোম্পানি কেবল সংখ্যায় নয় একেবারে মোট কোম্পানির শতকরা হারেই লাগামহীন গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৭]



Note: Firm-level data is used to calculate the share of listed firms that are more than ten years old with an interest coverage ratio less than one for three years in a row

Source: Datastream, Worldscope, DB Global Research

এই সমস্যা কেবল আমেরিকার ভাবলে ভুল হবে। সমস্যাটা পুরো বিশ্বব্যাপী। চারিদিকে জনাব রিবার মত সম্পদলোভী আর সুদ-লাভিং প্রতিষ্ঠানে ভরা, যাদের অসামান্য শক্তির কল্যাণে জম্বি কোম্পানির সুনামি বয়ে যাচ্ছে পুরো বিশ্বের উপর দিয়ে। এই জম্বি কোম্পানিগুলো মৃত্যুর প্রহর গুনছে একটি অর্থনৈতিক ঝড়ের অপেক্ষায়, যেই ঝড় এসে তাদের সম্পদ ঋণদাতাদের হাতে তুলে দিবে। বিশ্বের মানি সিস্টেম সত্যিকার অর্থেই যে সবার জন্যই একটা ফাঁদ, সেই ফাঁদের রশি আর প্যাঁচই এতক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭ https://www.isabelnet.com/share-of-u-s-zombie-companies/



ছবি - বিশ্বব্যাপী জম্বি কোম্পানির শেয়ার

Reference: Angela De Martiis, Franziska Julia, Peter Thomas Heil (2020). 'Are you a Zombie? A Supervised Learning Method to Classifz Unviable Firms and Identifz the Determinants.' Research Gate[8]

৮ https://www.researchgate.net/publication/342764875_Are_you_a_Zombie_A_Supervised_Learning_Method_to_Classify_Unviable_Firms_and_Identify_the Determinants

আরও গভীরে দেখুন

এতক্ষণ হিসাব করলাম ব্যাংক সব সম্পত্তি কব্জাগত করে রাখলে কি হবে? কিন্তু বর্তমান বিশ্বে আমরা দেখে থাকি কেউ দেউলিয়া হয়ে পড়লে ব্যাংক সাধারণত তার সম্পত্তি হাতে নিয়ে দীর্ঘদিন বসে থাকে না। ব্যাংক যেহেতু টাকা দিয়েই সুদের ব্যবসা করে, স্থায়ী সম্পত্তি কব্জাগত করে রাখা ব্যাংকের জন্য বিশেষ লাভজনক নয়। বরং ব্যাংক যা করে তা হচ্ছে বাজার দরে এই সম্পত্তি বিক্রি করে ক্যাশে রূপান্তর করে নেয় এবং সেই ক্যাশ দিয়ে সুদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

ব্যাংক যদি দেউলিয়া হওয়া ব্যক্তির সম্পত্তি বাজার দরে বিক্রি করে দেয় তাহলে ফলাফল কেমন হবে?

ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রি করার পরে তা সমাজের অপর কোনো সদস্যের হয়ে যাবে এবং বিক্রির টাকাটা ব্যাংকের হয়ে যাবে। যেই ব্যক্তি দেউলিয়া হলো সে নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং যেই ব্যক্তি তা ক্রয় করল সম্পদ তার হয়ে যাবে। এভাবে সমাজে একদল নিঃস্ব এবং একদল সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ তৈরি হতে থাকবে। এক বাক্যে আমরা বলতে পারি অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হবে।

সম্পত্তি কিনে নিতে ধনী পরিবারকেও অনেক টাকা খরচ করতে হবে। আমরা বর্তমানে অর্থনীতির এমন একটি পর্যায় নিয়ে আলোচনা করছি যেখানে প্রতিটি টাকাই ঋণ। এমন পরিবেশে মাত্রাতিরিক্ত সফল না হয়ে থাকলে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য বড় সম্পত্তি কেনার মতো ক্যাশ টাকা হাতে থাকবে না। সেজন্য ধনী ব্যক্তিদেরকেও সাধারণত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সম্পত্তি কিনতে হবে। ব্যাংক তখন কৈ-এর তেলে কৈ ভাজবে। দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পত্তি (যার মালিক এখন ব্যাংক) ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে সেই টাকাই আবার ব্যবসায়ীকে ঋণ হিসেবে দিয়ে দিবে।

এদিকে জমি কেনার পর শুরু হবে নতুন খেলা। এই জমিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ীকে সুদের হারের চেয়ে অধিক লাভজনকতা ধরে রাখতে হবে। জমি কিনে ফেলে রাখলে কিংবা বিনিয়োগ করার পর লাভজনকতা হারিয়ে ফেললে তিনি দেউলিয়া হয়ে যাবেন। প্রতি বছর সুদের হারের থেকে বাড়তি লাভ করলেই কেবল তিনি দেউলিয়া হবেন না। আর দৌড়ে পিছিয়ে গেলেই সব সম্পত্তি ব্যাংকের পেটে চলে যাবে। আশা করি, এখন বুঝতে পারছেন যে বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদীরা এক অনন্ত দৌড়ে থাকেন এবং পা ফসকে গেলেই চলে যান ব্যাংকের পেটে!

'Every time you borrow money, you're robbing your future self.'
Nathan W. Morris
Writer & Personal Finance Expert

'আপনি যতবার ঋণ নেন, ততবার আপনি আপনার নিজ ভবিষ্যৎ থেকেই চুরি করেন।'
নাথান মরিস
লেখক ও ব্যক্তিগত অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ

'A bank is a place where they lend you an umbrella in fair weather and ask for it back again when it begins to rain.'
Robert Lee Frost
'ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে ছাতা ধরে মেঘলা দিনে তা ফেরত চায়।'
রবার্ট লি ফ্রস্ট

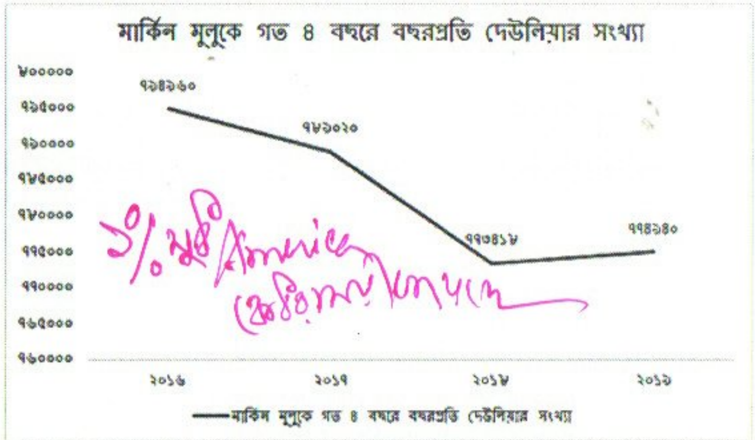
সব মিলিয়ে সম্পত্তি হাতে আসার পরে ব্যাংক (বা মহাজন) তা কব্জাগত না রেখে যদি বাজার দরে বিক্রি করে দেয় তাতে ফলাফলের বিশেষ কোনো উন্নতি হবে না। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্য করেছেন কি?

এই প্রক্রিয়ায় কোনো মুদ্রা সৃষ্টি হচ্ছে না বরং যেই পরিমাণ সুদ হাতে আসার কথা ছিল তা ঠিকই আসছে। শুধু তাই নয়, বিক্রিত মালের অর্জিত অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পুনরায় সুদে ঋণ হিসেবে অর্থনীতিতে যাচ্ছে এবং সম্পদ চুষে নেবার ঠিক আগের প্রক্রিয়াটাই চালু আছে। সব মিলিয়ে যা লাউ ছিল তা জটিল একটি কদুতে পরিণত হয়েছে।

২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৪ বছরে আমেরিকাতে দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করেছে ৩১ লাখ ৩২ হাজার ৩৩৮ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান (মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ)। মাত্র ৫ বছরে 'উন্নত' দেশের ১ শতাংশ মানুষ দেউলিয়া হয়ে গেল, এটা কেমন অর্থনীতি?[৯]

১০০ মানুষে ১ দেউলিয়া –

৯ https://www.uscourts.gov/news/2021/01/28/annual-bankruptcy-filings-fall-297-percent



আপনারা কি বুঝতে পারছেন, যে সুদের ঝড় আমেরিকার ১% কে মাত্র ৫ বছরে ধরাশায়ী করেছে তা আমাদের জন্য কতটা ভয়াবহ?

আরেকটি ব্যাপার আমরা তাত্ত্বিক ভাবে প্রমাণ করেছি, তা হলো যখন সব অর্থই হয়ে যাবে ব্যাংকের তখন সময়ের সাথে দেউলিয়া হবার পরিমাণ কেবল বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

নিচের চার্টে লক্ষ্য করুন। গড়পরতা আমেরিকার দেউলিয়ার হার বাড়ছে। এটা ভাবা স্বাভাবিক যে, দিন দিন মানুষ বাড়ছে, তাই মোট দেউলিয়ার পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু, এই চার্ট সেটা দেখাচ্ছে না, এই চার্ট দেখাচ্ছে প্রতি হাজারে গড়ে কতজন দেউলিয়া হচ্ছে। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের দিকে আমেরিকাতে প্রতি হাজারে ০.২ জন বা ০.৩ জন দেউলিয়া হতো বা প্রতি ৫-৬ হাজারে ১ জন দেউলিয়া হত। এমনকি আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক মন্দা, ১৯৩০ সালের মহামন্দার সময়েও হাজারে ০.৫ জন ব্যক্তি বা প্রতি ২ হাজারে ১ জন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়েছে। সেই তুলনায় গত ত্রিশ বছরে গড়পড়তা দেউলিয়ার হার হচ্ছে হাজারে পাঁচ জন! অর্থাৎ, গত শতাব্দির সবচেয়ে খারাপ সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ে দশ গুন বেশি মানুষ রেগুলার দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে! সুদভিত্তিক এই ভয়ংকর অর্থনৈতিক সিস্টেম ও মুদ্রাব্যবস্থা না বদলালে এই হার শুধু বাড়তেই থাকবে।[২১০]

১০ 2 https://www.creditslips.org/creditslips/2013/07/bankruptcy-filing-rate-decline-is-historically-anomalous.html



This chart represents the number of total U.S. bankruptcy filings since 1900 per 1,000 persons. The data represent twelve-month intervals ending June 30 of each year, the end of the government's fiscal year historically and the time frame for which early data are available. The first permanent U.S. bankrutpcy law was enacted in 1898. Major changes were adopted in 1938, 1978, and 2005. The chart uses total U.S. bankruptcy filings because of shifting definitions of "consumer" and "business" bankruptcy.

এমনকি আমাদের বাংলাদেশেও হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে দেউলিয়াত্ব বাড়ছে। ১৯৯৭ সালে তৈরি দেউলিয়া আইনে এখন পর্যন্ত ৬৩৮ জন বা কোম্পানি দেউলিয়ার জন্য আবেদন করেছে। ২০২১ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, চলমান ১৭৯টা মামলায় আটকে আছে ব্যাংকের ২৬০০ কোটি টাকা।[১১] কেবল বাংলাদেশ নয়, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কি পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে আমেরিকার মত পরিণতির দিকেই নিশ্চিতভাবে ধাবিত করছে না?

১১ https://www.tbsnews.net/bangladesh/court/cases-drag-bankruptcy-courts-256438

চিন্তার খোরাক

- আমাদের দেশে কে বা কারা মুদ্রা তৈরি করে?
- এর ফলাফল অর্থনীতিতে কেমন হতে যাচ্ছে?

শেষ পরিণতি

সমাজের সবার মুদ্রা মহাজনের হাতে চলে গেলে যেমন জীবন বদলে যাবে না, ঠিক তেমনি সকল সম্পত্তি তার হাতে গেলেও সবকিছু বদলে যাবে না।

রূপসাগরের কথাই চিন্তা করি, সেখানকার সকল সম্পত্তি রিবা পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের সদস্য মহারাজার হাতে আসলেও যেই ব্যক্তি আগে কৃষক ছিল সে কৃষিকাজই করবে, কিন্তু জমির মালিক হবে মহারাজা; কৃষক তাকে কেবল খাজনা দিবে। যে ব্যক্তি আগে ব্যবসায়ী ছিল সে ব্যবসাই করবে, কিন্তু দোকানের মালিক হবে মহারাজা, ব্যবসায়ী তার থেকে দোকান ভাড়া দিয়ে ব্যবসা চালাবে। তেমনি করে সব বাগ-বাগিচা, বাড়িঘর সবকিছুর মালিকও হবে মহারাজা (অনেকটা ব্যক্তি মালিকানাধীন সমাজতন্ত্রের মত)। এভাবে সমাজে মহারাজার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সবাই তাকে খাজনা দিয়ে আগের মতোই জীবিকার অন্বেষণ করবে।

এই পর্যায়ে এসে মহারাজা কেবলমাত্র সুদ ক্ষমা করে সম্পদের একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রেখে এখানেই গল্প শেষ করে দিতে পারে। অথবা সে চাইলে এখানে শেষ না করে সুদের চাকা আরও প্রসারিত করতে পারে।

আমরা জানি, মোট ঋণের পরিমাণ মোট মুদ্রার পরিমাণের সমান হয়ে গেলে সুদ প্রদান করা গাণিতিক ভাবেই অসম্ভব। কিন্তু মুদ্রা ছাড়া যেহেতু মানুষ প্রায় চলতে পারে না, সব সম্পদ এবং সব মুদ্রা একজনের হয়ে যাওয়ার পরও মহারাজার কাছে রূপসাগরে সবাই ঋণ নিতে আসতে হবে। এমন অন্তিম পরিস্থিতিতে ঋণের উপর সুদ থাকলে তা পরিশোধ করা হবে কিভাবে? এবং পরিশোধ না করতে পারলে অধিবাসীদের কি হবে তা ভাবনার বিষয়।

প্রথমত, এমন পরিস্থিতিতে ঋণ নেয়ার পরবর্তীকালেই কড়ি ফেরত দেবার তীব্র প্রতিযোগিতা (ভেলার ভেলকির মতোন) শুরু হয়ে যাবে। তবে অর্থনীতিতে মোট কড়ির সংখ্যা মোট দায়ের চেয়ে কম হওয়ায় ঋণ পরিশোধ করতে মরিয়া হয়ে গেলেও কিছু মানুষকে দেউলিয়া হতে হবেই। কারণ কড়ি হাতে না পেলে পূর্বের ন্যায় স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণমুক্ত হতে পারবে না এখন। এর থেকে বের হবারও কোনো উপায় নেই। তাহলে দেউলিয়াত্বের দায় শোধ করবে কি দিয়ে?

মানুষের সকল অর্থ, বিত্ত এবং সম্পত্তি হারিয়ে ফেললেও একটি জিনিস থেকে যায়। তা হচ্ছে তার কর্মদক্ষতা। এই কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আবারো আয় রোজকার করতে পারে এবং সম্পদ জোড়াতে পারে। কর্মক্ষমতা হচ্ছে একটি গোপন সম্পদ যার বিনিময়ে একজন নিঃস্ব ব্যক্তি পরিশ্রম দ্বারা আয়-রোজকার করতে পারে। লোভী মহাজনের এই সম্পদের উপর নজর পড়বে না তা কি হয়? দেউলিয়া ব্যক্তির দায় মোট দশ মোহর হলে এবং তার আয় মাসে ১ মোহর হলে মহাজন তাকে বলবে, 'সামনের দশ মাস আমার গোলামি খাটো, তাহলে তুমি ঋণের দায় থেকে মুক্তি পাবে।' কোন গৃহিণী দেউলিয়া হলে সেও সেবা দাসী হিসেবে তার সেবা করবে। এভাবে রূপসাগরের সব নারী-পুরুষ সময়ে অসময়ে তার গোলামি করতে থাকবে।

'The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is the people versus the banks.'

–Lord Acton
English Catholic Historian, Politician, and Writer (1832 - 1902)

'যে সমস্যা শতাব্দীকাল ধরে চলে আসছে এবং যার মোকাবেলা আজ বা কাল করতেই হবে, তা হচ্ছে মানুষ বনাম ব্যাংক।'

– লর্ড অ্যাক্টন
ইংরেজ ইতিহাস বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ ও লেখক (১৮৩২-১৯০২)

'If the people only understood the rank injustice of our money and banking system, there would be a revolution by morning.'

–Andrew Jackson
7th US President

'যদি মুদ্রাব্যবস্থা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার চরম অবিচারটা মানুষ বুঝতে পারতো, কাল সকাল নাগাদ গণআন্দোলন শুরু হয়ে যেত।'

- অ্যান্ড্রু জ্যাকসন
৭ম মার্কিন প্রেসিডেন্ট

শেষ রক্ষা করা যাবে?

এই পর্যন্ত আলোচনা করেছি যে একটি অর্থনীতিতে প্রতি বছর কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রা প্রবেশ করে থাকলে তা সুদের পাইপে সুদী প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাবে। কিন্তু যদি কোন অর্থনীতিতে মুদ্রার সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে

থাকে (প্রথম বছর ১০০ মুদ্রা, তার পরের বছর ২০০ মুদ্রা, তারপরে ৪০০ মুদ্রা, ৮০০ মুদ্রা, ১৬০০ মুদ্রা, এভাবে চলতে থাকে), তাহলে কি উপরে বর্ণিত ফলাফল থেকে বাঁচা সম্ভব?

এক শব্দে প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। চক্রবৃদ্ধি হারে মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সুদের দ্বারা সকল মুদ্রা কুক্ষিগত হবে না। তাই সুদ দাস হবার ভয় নেই। তাহলে বর্তমান বিশ্বে চক্রবৃদ্ধি হারে মুদ্রার সংখ্যা বাড়াতে পারলে কি আমরা চিন্তা মুক্ত থাকবো? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে মুদ্রা কিভাবে তৈরি হচ্ছে তার উপর।

মুদ্রা যখন প্রাকৃতিক

মুদ্রা যদি প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বস্তু (যেমন সোনা, রূপা, তামা বা সাগর থেকে ভেসে আসা কড়ি) হয়, তা সুদের সাথে পাল্লা দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে (exponentially) প্রবেশ করতে থাকলে সাম্যাবস্থা বজায় থাকবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সসীম বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে পারে না দীর্ঘদিন, কিছুদিন চক্রাকারে বেড়ে এক পর্যায়ে সীমায় পৌঁছে যায়।

সবমিলিয়ে, সসীম বিশ্বে অনন্তকাল কোন সম্পদ চক্রবৃদ্ধিতে বাড়তে পারে না। তাই খনি থেকে উত্তোলিত সোনা কিংবা সাগর পাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া কড়ি সুদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না এবং সুদের পাইপে সবকিছু মহাজনের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যাবে।

মুদ্রা যখন সরকারি

টাকা যদি সরকার নিজে তৈরি করে এবং এই টাকা সুদমুক্ত উপায়ে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে তাহলে সাম্যাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব। এই ব্যবস্থায় সরকার নিজেই টাকা ছাপাবে এবং সেই টাকা জনগণের কল্যাণে ব্যয় করবে। এভাবে রাষ্ট্রে সবার হাতে হাতে টাকা পৌঁছে যাবে এবং সেই টাকায় সবাই কেনা-বেচা, লেনদেন ও সঞ্চয় করবে। সুদের সাথে পাল্লা দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে যদি সরকার নতুন টাকা ছাপাতে পারে, মুদ্রার ভারসাম্য নষ্ট হবে না, অর্থাৎ সব টাকা সুদী প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় চলে যাবে না (সাম্যাবস্থা বজায় থাকবে)।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে এমন একটি ভারসাম্য ধরে রাখতে সুদ এবং মুদ্রা বৃদ্ধির হারের সাথে জিডিপির প্রবৃদ্ধি সমানতালে আগাতে হবে। অন্যথায় অর্থনীতিতে অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর ফলে মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি শুরু হয়ে যাবে।

মুদ্রা যখন ব্যাংকের হাতে

ব্যাংক নিজেই যদি মুদ্রা তৈরি করে ঋণ দেয়, তাহলে কি হতে পারে তার বিস্তারিত বর্ণনা... আসিতেছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১. সুদ না থাকলে প্রথম দুটি প্রেক্ষাপটে খুব সুন্দরভাবে মুদ্রাব্যবস্থার সাম্যাবস্থা বজায় থাকবে, কোনো কসরত করতে হবে না। কারণ, এই দুটি প্রেক্ষাপটে ভারসাম্য নষ্ট হবার জন্য মুদ্রাব্যবস্থা দায়ী না, দায়ী সুদ।
২. ক্রিপ্টো-মুদ্রা দ্বারাও ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। তবে সরকারি মুদ্রার মতই এই ভারসাম্য ভালো ভাবে ধরে রাখতে পারার শর্ত হচ্ছে সুদ এবং মুদ্রা বৃদ্ধির হারের সাথে জিডিপির প্রবৃদ্ধি সমানতালে আগানো। অন্যথায় তীব্র মূল্যস্ফীতি শুরু হবে। তবে সুদ-চর্চা না থাকলে এই মুদ্রায় ভারসাম্য নষ্ট হবার হবার সম্ভাবনা নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অদৃশ্য মুদ্রা

আমরা প্রথমে দেখলাম কিভাবে সুদের দ্বারা সব টাকা সুদ কারবারি বা ব্যাংকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। তার পরবর্তীকালে আমরা দেখালাম কিভাবে সব সম্পত্তিও একসময় সুদ কারবারির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়।

সুদের চক্র চালাতে থাকলে একজন সব সম্পত্তির মালিক হতে পারবে সত্য, কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতিতে দ্রুত পৌঁছানোটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। দ্রুত এমন ফলাফলে পৌঁছাতে চাইলে দেশে গণআন্দোলন শুরু হয়ে তার দীর্ঘদিনের ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই সিস্টেমে নতুন নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোগ কিংবা জনগণের কাজ করার স্পৃহা থাকে না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে জনগণ যদি অতিষ্ঠ হয়ে বিকল্প মুদ্রাব্যবস্থা চালু করে ফেলে, মহাজনের বা ব্যাংকের ক্ষমতার হাতিয়ার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তাই একই সাথে অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার পাশাপাশি মুদ্রাব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব ধরে রাখতে ব্যাংক একটি বাস্তবসম্মত ফন্দি বের করবে। 'অদৃশ্য মুদ্রা।' অর্থনীতিতে ভার্চুয়াল কারেন্সি বা অদৃশ্য মুদ্রা আনতে পারলেই, উভয় সংকট কেটে যাবে। নতুন মুদ্রা প্রবেশ করালে পুরানো ঋণের সুদ প্রদান করার সামর্থ্য তৈরি হবে। আর মুদ্রা যদি বিনিয়োগ আকারে প্রবেশ করানো হয়, উন্নয়নের ধারা ভালোভাবে অব্যাহত থাকবে। সবশেষে, ব্যাংক নিজেই ভার্চুয়াল মুদ্রা তৈরি করলে এর মালিক ব্যাংকই থাকবে। তাই মুদ্রাব্যবস্থার উপর ব্যাংকের পূর্ণ ক্ষমতা অটুট থাকবে।

অদৃশ্য মুদ্রা তৈরি করার প্রক্রিয়া খুব একটা জটিল না। একজন ব্যক্তি যখন ব্যাংকের থেকে ঋণ নিতে আসবে, ব্যাংক তখন তার অ্যাকাউন্টে অদৃশ্য টাকার ব্যালান্স লিখে দিবে। পরবর্তীকালে ঋণ নেওয়া ব্যক্তি ব্যাংক ব্যালান্সকে সাধারণ টাকার মতই ব্যবহার করবে। এভাবে অর্থনীতিতে অদৃশ্য এবং দৃশ্য টাকার কার্যত কোনো তফাত থাকবে না।

ব্যাংক তার নিজস্ব টাকা বাজারে আনলে বস্তুগত মুদ্রার (কাগজ-সোনা ইত্যাদি) উপর সকলের নির্ভরশীলতা কমে যাবে এবং অর্থনীতির চাকাও সচল থাকবে। আর এই টাকা যেহেতু ব্যাংক নিজেই তৈরি করবে, এর মালিকানাও সম্পূর্ণ রূপে তার হাতে থাকবে।

পুরো সিস্টেমটি কারো কাছে সায়েন্স ফিকশন কিংবা গাঁজাখুরি গল্প বলে মনে হতে পারে অথবা ভাবছেন হীরক রাজার দেশের গল্প। হীরক রাজার নাকি ব্যাংক রাজার দেশের গল্প সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চলুন হাওয়াই টাকার অধ্যায় শুরু করি।

হাওয়াই টাকা

ভার্চুয়াল কারেন্সি বা হাওয়াই টাকাকে ব্যাংক ক্রেডিট মানিও বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে যেহেতু ব্যাংক গুলি সব লেনদেন ডিজিটালি সম্পন্ন করে তাই একে অনেকে 'ইলেকট্রনিক মানিও' বলে। আবার ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ঋণ দেওয়ার ফলে এই টাকা সৃষ্টি হয় বলে একে Debt Money (বা ঋণ টাকা'ও) বলা হয়ে থাকে। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলে Broad Money (মোটা টাকা)। বর্তমান বিশ্বে একটি উন্নত দেশের মোট টাকার 'কমপক্ষে' ৯০ শতাংশই এই ব্রড মানি বা হাওয়াই টাকা!

হাওয়াই টাকা বা ব্রড মানি শুধু আধুনিক বিশ্বের একটি আবিষ্কার কিংবা উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণেই তৈরি করা সম্ভব ব্যাপারটি এমন নয়। অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের মধ্যে যারা মুদ্রাব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে অসচেতন, তারা হয়তো অবাক হবেন শুনলে যে হাওয়াই মুদ্রা প্রচলনের কূট-কৌশল বেশ পুরোনো। রিচার্ড ভার্নার (Richard Werner) ৫,০০০ বছর আগের ব্যবিলনীয় সভ্যতার ক্লে প্লেটেও হাওয়াই টাকার অনুরূপ ব্যাংকিং লেনদেনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। আর বর্তমানে তো তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তবে সবচেয়ে মজার ব্যপার হচ্ছে আপনি চাইলে নিজেও ঘরে বসে হাওয়াই টাকা তৈরি করতে পারবেন।

মূলত দুই ভাবে হাওয়াই টাকা তৈরি করা যায়:

১. কোন ধরনের ডেপজিট ব্যতীত এবং

২. সবার কাছ থেকে ডেপজিট বা টাকা জমা নিয়ে।

প্রথমে আমরা দেখাবো কিভাবে ডেপোজিট স্কিম ছাড়াই ক্রেডিট মানি তৈরি করা যায়। তার পরবর্তীকালে আমরা দেখাবো কিভাবে ডেপজিট স্কিম

চালু করে আরও সফলভাবে হাওয়াই টাকা উৎপন্ন করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি তুলনামূলক জটিল; তাই আমরা সেই আলোচনা একটু পরে করবো। কেউ গণিত ভয় পেলে এই অধ্যায়টি বাদ দিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক বড় একটি রহস্য আপনার অজানা রয়ে যাবে। তাই কষ্ট করে হলেও প্রাথমিক ধারণা নিয়ে রাখতে পারেন। যাই হোক, আর রহস্য না বাড়িয়ে চলুন, আপনাদের দেখাই একেবারে কাঠের সিন্দুক ও মুদ্রা দিয়ে কিভাবে ঘরে বসে হাওয়াই টাকা তৈরি করা যায়।[১৫]

এক দেশে ছিল এক ব্যাংক...

নাম তার 'মরীচিকা'। সেই মরীচিকা ব্যাংকের মালিকে নীলকান্তের মোট ৪ হাজার মোহর আছে। নিয়ম অনুযায়ী সে এই ৪ হাজার মোহর ধার দিবে এবং মেয়াদ শেষে সুদে আসলে ঋণ ফেরত নিবে। কিন্তু সে লক্ষ্য করল যাদেরকে সে ঋণ দিচ্ছে তারা সবাই একবারে সব টাকা তুলে নিচ্ছে না। প্রয়োজন মাফিক ধীরে ধীরে ঋণের টাকা তুলে খরচ করছে।

মরীচিকা ব্যাংক যখন জহরত সওদাগরকে ৪ হাজার মোহর ঋণ ৪ বছরের জন্য অনুমোদন করলো সে দেখল সওদাগর একবারে সব টাকা তুলছে না। এদিকে সওদাগর ভাবল সব মোহর একসাথে তুলে বাসায় নিয়ে রাখা মহা ঝামেলা। এই টাকা বরং ব্যাংকেই থাকুক, ধীরে ধীরে তুলে খরচ করতে থাকি, সেই ভালো। এভাবে প্রতি বছর ১,০০০ মোহর করে তুলে সওদাগর খরচ করতে লাগলো।

এদিকে মরীচিকা ব্যাংক দেখলো প্রথম বছরের পুরা সময় ৩ হাজার মোহর সিন্দুকে অলস পড়ে আছে। ব্যাংকের কাছে অলস মোহর সহ্য হওয়ার কথা না, তাই ব্যাংক এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাপড় ব্যবসায়ী মণিকে ১৫০০ মোহর এবং অলংকার ব্যবসায়ী মুক্তাকে ১৫০০ মোহর করে মোট ৩ হাজার মোহর ঋণ তিন বছরের জন্য দিয়ে দিল।

দেখুন, মণি ও মুক্তার নামে মোট ৩০০০ মোহরের ঋণ অনুমোদন করলে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪০০০ + ৩০০০ = ৭০০০ মোহর। অথচ মরীচিকার সিন্দুকে ছিলই কেবল ৪০০০ মোহর।

১৫ এই বিদ্যা কোন খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করার অনুরোধ রইল। কেবল বর্তমান দুনিয়ার স্বরূপ উন্মোচনের স্বার্থে এই আলোচনা সামনে আনা হয়েছে। এই লেখা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কেউ অসদুপায় অবলম্বনের কাজে ব্যবহার করলে দায়ভার সম্পূর্ণ তার।

এদিকে ঋণ অনুমোদনের পরে মণি-মুক্তাও নিশ্চয়ই একবারে সব মোহর তুলে ফেলবে না। তারা তিন বছরে আস্তে আস্তে করে এই টাকা খরচ করবে। তাই ব্যাংক এবার নতুন ২ জন গ্রাহক রুপাই কর্মকার ও সোনাই শিকদারকে পাঁচশ পাঁচশ করে মোট ১ হাজার মোহর ঋণ ১ বছরের জন্য অনুমোদন দিয়ে দিবে। এভাবে সর্বসাকুল্যে ব্যাংকের প্রদান করা ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮,০০০ মুদ্রায়। কিন্তু ৪০০০ মোহর থেকে ৮০০০ মোহর ঋণ দেওয়া সম্ভব হল কিভাবে?

খেয়াল করে দেখুন, ব্যাংক থেকে যারা ঋণ নিবে তাদের সবার মোহর একত্রে এক সিন্দুকেই আছে। তাতে কেউ আপত্তি করছে না, সময় মত নিজ পাওনা হাতে পেলেই সবাই সন্তুষ্ট থাকবে। এই ব্যাপারটা আপনাদের সকলের কাছেই স্পষ্ট।

আমরা ছোটবেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম, এক দেশে এক কুমিরের ১১টি সন্তান ছিল। সেই কুমির তার ১১টি বাচ্চাকেই শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়াশুনা করতে পাঠায়। কচি কচি কুমিরের বাচ্চা পেয়েতো শেয়াল পণ্ডিত মহাখুশি। রোজ সকালে সে একটি করে বাচ্চা খায় আর মনের সুখে বাকিদের গান শোনায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রতিদিন বিকালে কুমির মা তার সন্তানদের দূর থেকে গুনে যায়। শেয়াল পণ্ডিতও বাধ্য শিক্ষকের মত গর্তের ভেতর থেকে এক বাচ্চা বার বার বের করে দেখায় আর কুমির খুশি হয়ে ফিরে যায় এই ভেবে যে তার ১১টি বাচ্চাই অক্ষত আছে। এভাবে, সব বাচ্চা খোয়ানোর আগ পর্যন্ত কুমির সন্তুষ্ট থাকে। ব্যাংকের অবস্থা ঠিক শেয়াল পণ্ডিতের মতোই। এক মুদ্রা বার বার দেখানোর কাজে নেমেছে। যেহেতু মোহরের গায়ে নাম লেখা থাকে না কোনটা জহরত সওদাগরের বা কোনটা মণি ও মুক্তার, কেউই বুঝতে পারবে না কার মোহর কাকে দেখানো হচ্ছে বা ধার দেওয়া হচ্ছে। সবাই দেখবে তাদের মোহর সিন্দুকে সুন্দর জমা আছে।

তবে কুমিরের গল্পের সাথে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য হচ্ছে, ঋণের উপর সুদ আসে বলে সিন্দুকের মোহরে কোনো ঘাটতি দেখা দিবে না! আপনি যদি ঘুণাক্ষরেও ভেবে থাকেন বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা এমনটি করছে না, আপনার ধারণা ১০০% ভুল। বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা এর চেয়েও বি-শা-ল বড় ধোঁকাবাজি করছে। সেই শিক্ষা সফরে যাওয়ার আগে, আমরা আমাদের হাতের হিসাবটা শেষ করে আসি।

শুরুতে একেবারে সরল চিন্তা করি। ব্যাংক প্রথমে সওদাগর ছাড়া আর কাউকে ঋণ না দিলে কি হত?

১. সওদাগর ৪ হাজার মোহর ৪ বছরের জন্য ঋণ নেয়ার পর, প্রথম বছর তুলবেন মোট ১ হাজার মোহর।

ব্যাংকের সিন্দুকে বাকি থাকবে ৩ হাজার মোহর।

- বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০ মোহর
- সিন্দুকে জমা থাকবে মোট ৩ হাজার + ৪০০ = ৩৪০০ মোহর

২. দ্বিতীয় বছর সওদাগর সিন্দুক থেকে তুলবে ১ হাজার মোহর।

- দ্বিতীয় বছর শেষে সওদাগর সুদ দিবে ৪০০ মোহর।
- দ্বিতীয় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে (৩৪০০ −১০০০) + ৪০০ (এই বছরের সুদ) = ২৮০০ মোহর।

৩. তৃতীয় বছরে সওদাগর সিন্দুক থেকে নিবে ১ হাজার মোহর।

- তৃতীয় বছর শেষে সওদাগর সুদ প্রদান করবে ৪০০ মোহর।
- তৃতীয় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে (২৮০০ −১০০০) + ৪০০ (এই বছরের সুদ) = ২২০০ মোহর।

৪. চতুর্থ বছরে সিন্দুক থেকে নিবে ১ হাজার মোহর।

- চতুর্থ বছরের প্রথমে সিন্দুকে থাকবে (২২০০ −১০০০) = ১২০০ মোহর।
- চতুর্থ বছর শেষে সওদাগর সুদ প্রদান করবে ৪০০ মোহর।
- চতুর্থ বছর শেষে সওদাগর আসল ফেরত দিলে ব্যাংকের কাছে চলে আসবে মোট ৪০০০ + ৪০০ + ১২০০ = ৫৬০০ মোহর।

একবারে ৪০০০ মোহর তুলে চার বছর পরে একবারে ফেরত দিলেও ৫৬০০ মোহরই হত। যেই লাউ সেই কদু।

এবার দেখি, সবাইকে একত্রে ঋণ দিলে কি ঘটনাটা ঘটে। ব্যাংক একই সাথে সওদাগরকে ৪০০০ মোহর ৪ বছরের জন্য, মণি ও মুক্তাকে ১৫০০ মোহর করে মোট ৩০০০ মোহর ৩ বছরের জন্য এবং রুপাই কর্মকার ও সোনাই শিকদারকে ৫০০ করে মোট ১০০০ মোহর ১ বছর মেয়াদে ঋণ দিবে। প্রশ্ন হচ্ছে, ৪ হাজার মোহর দিয়ে কি করে ৮ হাজার মোহরের অভাব পূরণ করা সম্ভব? সেই অংকটা মাত্র ১০% সরল সুদ ধরে দেখাচ্ছি।

১ম বছর

জহরত সওদাগর ১০০০ মোহর তুলবে

দুই ব্যবসায়ী মণি ও মুক্তা ৫০০ করে মোট ১০০০ মোহর তুলবে

আর সোনাই কর্মকার ও রুপাই শিকদার এক বছরের জন্য ঋণ নিয়েছিল তাই তারা সব মোহরই তুলবে। সেটা হল ৫০০ করে মোট ১০০০ মোহর।

সুতরাং, প্রথম বছরের শুরুতে সিন্দুক থেকে তোলা হবে ৩০০০ মোহর তাই ব্যাংকের সিন্দুকে বাকি থাকবে ১ হাজার মোহর।

- বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০ + ৩০০ + ১০০ = ৮০০ মোহর
- প্রথম বছর শেষে সোনাই ও রুপাই আসল ফেরত দিলে আসবে ১০০০ মোহর
- তাহলে, প্রথম বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে
  ১০০০ + ৮০০ (১ম বছরের সুদ) + ১০০০ (সোনাই+রুপাইের ফেরত দেয়া আসল) = ২৮০০ মোহর

২য় বছর

- ২য় বছরের শুরুতে সওদাগর তুলবে ১০০০ মোহর এবং মণি ও মুক্তা তুলবে ১০০০ মোহর। তাই মোট ২০০০ মোহর তোলা হবে।
- ২য় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০ + ৩০০ = ৭০০ মোহর
- তাহলে, ২য় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে
  ২৮০০ −২০০০ (২য় বছরে তোলা মোহর) + ৭০০ (২য় বছরের সুদ) = ১৫০০ মোহর

৩য় বছর

- ৩য় বছর সবাই তুলবে মোট ২০০০ মোহর
- ৩য় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০ + ৩০০ = ৭০০ মোহর
- ৩য় বছরে মণি-মুক্তা তাদের সুদসহ আসল ৩০০০ মোহর ফেরত দিয়ে দিবে
- তাহলে, ৩য় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে
  ১৫০০ −২০০০ (৩য় বছরে তোলা মোহর) + ৭০০ (৩য় বছরের সুদ) + ৩০০০ (দুই ব্যাবসায়ীর আসল) = ৩২০০ মোহর

৪র্থ বছর

- ৪র্থ বছরের শুরুতে কেবল সওদাগর তুলবে ১০০০ মোহর
- ৪র্থ বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০ মোহর

- ৪র্থ বছরে সওদাগর সুদসহ আসল ৪০০০ মোহর ফেরত দিবে
- তাহলে, ৪র্থ বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে
  ৩২০০ - ১০০০ (৪র্থ বছরে তোলা মোহর) + ৪০০ (৪র্থ বছরের সুদ) + ৪০০০ (দুই সওদাগরের আসল) = ৬৬০০ মোহর

দেখা গেল ব্যাংক ৪০০০ মোহরের বিপরীতে ৮০০০ মোহর ঋণ দিয়ে পারও হয়ে গেল। এবারে ব্যাংক ৬৬০০ মোহর দিয়ে মোট ১৩২০০ মোহর ঋণ দিতে পারবে। এভাবে চলতে থাকবে ...

এই হিসাব উপরের ছবির মতন না মিললে কোনো সমস্যা নেই। যদি কোন কারণে সিন্দুকের মোহরে টান পড়ে যায়, ব্যাংক সাময়িক সময়ের জন্যে ঋণ নিলে কোনো সমস্যা নেই। কারণ দিন শেষে ব্যাংক ৮ হাজার মোহরের উপর সুদ গ্রহণ করছে যেখানে পুঁজিই মাত্র ৪ হাজার মোহর।

সূক্ষ্মদর্শী পাঠক হয়তো ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন তৃতীয় বছরের শুরুতে ব্যাংকের হাতে ছিল ১৫০০ মোহর, কিন্তু সেই বছর ব্যাংককে দিতে হয়েছে ২০০০ মোহর। এই ধরনের ঝামেলা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। উপরে ব্যাংক সাময়িক সময়ের জন্য কারো থেকে ঋণ নিয়েছিল। ব্যাংক ৫০০ মোহর ঋণ এক বছরের জন্য নিলে ৫০ মোহর সুদ দিলেই শেষ। বাকিটা তার লাভ।

বাজারে সুদের হার যদি ১০ শতাংশের বেশি হতো তাহলে ব্যাংক আরও বেশি হাওয়াই মুদ্রা তৈরি করতে পারত। আর যদি সুদের হার ১০ শতাংশর কম হতো তাহলে আরও কম হাওয়াই মুদ্রা তৈরি করতে পারত।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সবাই একই সাথে সব মোহর তোলা শুরু করলে ব্যাংককে প্রমাদ গুণতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সবাই একসাথে সবকিছু খরচ করে ফেলে না এবং আরও মজার ব্যপার হচ্ছে মাঝে মাঝে খরচ করা মোহরও ঘুরে ফিরে ব্যাংকেই চলে আসে। এভাবে এই ব্যবস্থা চালু থাকে।

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, সবাই একসাথে এসে তাদের মোহর গণনা করতে গেলেও ব্যাংক হিসেব দিতে পারবে না। ব্যাংক যদি সব অ্যাকাউন্টের নামে ছোট ছোট সিন্দুক বানাত এবং সেই সিন্দুকগুলোর চাবি সেই অ্যাকাউন্টের মালিকের কাছেই থাকত, তাহলে ব্যাংকের বাড়তি লাভের সুযোগ থাকতো না। কিন্তু ব্যাংক একটা কুঠুরিতেই এলাকার সবার মোহর জমা রাখে। এভাবে এক মুদ্রা কয়েকবার ধার দেওয়ার ফলে হাওয়াই মুদ্রা তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের কাছে মোহর না থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক তা সৃষ্টি করে ফেলে এবং মোহর হাতে থাকার মতই সমান সুযোগ সুবিধা (সুদ) ভোগ করে।

একারণে সিন্দুকের ডালা বন্ধ রাখা বা মোহর গোপন করে রাখা কিন্তু হিসাব উন্মুক্ত রাখা ব্যাংকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একমাত্র সুদের কারবারেই এমন কারসাজি করে টাকা তৈরি করা সম্ভব যা সুদ এবং ব্যবসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য।

সুদের হালখাতা

ব্যাংক যদি আরেকটু কোমল হয় এবং ঋণ অনুমোদনের সাথে সাথে সুদ গণনা শুরু না করে, অর্থাৎ, কেবল মাত্র যে পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে তার উপরেই সুদ গণনা করে, যেমনটা আমরা বর্তমান ব্যাংকিং সিস্টেমে দেখে থাকি, তাহলে হিসেবটা কেমন হবে?

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে বর্তমান যুগে একটি ব্যাংকে গিয়ে ভল্ট খুলে টাকা গুনে দেখার সুযোগ কারো নেই। ব্যাংক সময়মত টাকা দিতে পারলেই ব্যাংকে টাকা আছে তা আমাদের জন্য বিশ্বাস করার কারণ হিসেবে যথেষ্ট। তাই আগের গল্পের মত এক টাকা বার বার দেখানোর প্রয়োজন নেই।

তাহলে আমাদের কাঠামোতে মোট দুটি পরিবর্তন আসছে।

১। কোন গ্রাহক যে বছর যতটুকু ঋণ নিবে কেবল ততটুকুর উপর সুদ আসবে, পুরো অ্যামাউন্টের উপর না এবং

২। ব্যাংক যেহেতু সিন্দুকের ডালা খুলছে না কোনো অলস মোহর সে সিন্দুকে পড়ে থাকতে দিবে না।

সব মিলিয়ে আমরা আধুনিক ব্যাংকিং এর আরও কাছাকাছি চলে এসেছি।

এবারে আমরা হিসাব কষতে বসি। সিন্দুকে মোহরের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার। এই ৪ হাজারের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ দিয়েছে ৮ হাজার মোহর।

এবার যেহেতু সিন্দুক খোলার প্রয়োজন নেই, ৮ হাজার মুদ্রা ঋণ দিয়ে দেবার পরে যদি আরো একজন ব্যবসায়ী হীরা সাহেব এসে ২ হাজার মোহর ঋণ চায় দুটি বছরের জন্য, ব্যাংক কি করবে? হীরা সাহেব ঋণ নেবার যোগ্য হলে ব্যাংক ওনাকে ফিরিয়ে না দিয়ে বলবে, 'ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই।'

পূর্বের মতই ব্যাংক হীরা সাহেবের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে ২ হাজার মোহর লিখে দিবে। এভাবে ৪,০০০ মুদ্রার বিপরীতে ১০,০০০ মুদ্রা তৈরি হয়ে গেল। কেউ বুঝতে পারবে না কি হচ্ছে।

আগের মত এবারেও সিন্দুকে আছে ৪০০০ মোহর এবং ব্যাংক এবার ঋণ দিল এভাবে :

১. জহরত সওদাগরকে ৪০০০ মোহর ৪ বছরের জন্য
২. মণি ও মুক্তাকে ৩০০০ মোহর ৩ বছরের জন্য
৩. হীরা সাহেবকে ২০০০ মোহর ২ বছরের জন্য
৪. সোনাই কর্মকার ও রুপাই সিকদারকে ১০০০ মোহর ১ বছর মেয়াদে ঋণ দিল।

প্রথমত, সবাই যে মেয়াদে ঋণ নিয়েছে, মোট ঋণের তত ভাগের ১ ভাগ প্রতি বছর তুলবে। অর্থাৎ সওদাগর তার ঋণ নিয়েছে ৪ বছরের জন্য। সে ১ম বছর মোট ঋণের ৪ ভাগের ১ ভাগ বা ১০০০ মোহর তুলবে। এভাবে প্রতি বছর সে ১০০০ মোহর তুলবে।

দ্বিতীয়ত, যে মোহর গ্রাহক তুলে নাই, সামনের বছরের জন্য রেখে দিছে, সেটার সুদ তাকে দিতে হবে না।

তৃতীয়ত, সব সুদ সরল হারে সুদ দিতে হবে।

সব মিলিয়ে খুবই গ্রাহক-প্রীতি পন্থা। এবার চলুন এমন হিসেব শুরু করে দেখা যাক।

১ম বছর

জহরত সওদাগর ১০০০ মোহর তুলে নিল
মণি ও মুক্তা ১০০০ মোহর তুলে নিল
হীরা সাহেব ১০০০ মোহর তুলে নিল
সোনাই ও রুপাই ১০০০ মোহর তুলে নিল

সুতরাং সবাই তুলে নিল মোট ৪ হাজার মোহর আর ব্যাংকের সিন্দুকে কিছু নেই।

- প্রথম বছর সিন্দুক থেকে তোলা হল ৪০০০ মোহর
- প্রথম বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০ মোহর
- সোনাই ও রুপাই আসল ফেরত দেয়ায় ফেরত আসলো ১০০০ মোহর
- তাহলে, প্রথম বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে মোট
৪০০ (১ম বছরের সুদ) + ১০০০ (সোনাই ও রুপাইর ফেরত দেয়া আসল) = ১৪০০ মোহর

২য় বছর

- সওদাগর, মণি-মুক্তা ও হীরা সাহেব ২য় বছরে তুলে নিল মোট ৩০০০ মোহর
- ২য় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে
- ৩০০ (১ম বছরের সওদাগর, মণি মুক্তা ও হীরা সাহেবের নেয়া মোহরের সুদ) + ৩০০ (২য় বছরের তুলে নেয়া মোহরের সুদ) = ৬০০ মোহর
- তাহলে, ২য় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে
৬০০ (২য় বছরের পাওয়া মোট সুদ) + ২০০০ (হীরা সাহেবের ফেরত দেয়া আসল) = ২৬০০ মোহর

এখানে বছরের শুরুতে ব্যাংকের হাতে টান পড়ে। তার কাছে মাত্র ১৪০০ মোহর ছিল কিন্তু দিতে হয়েছে ৩০০০ মোহর। এই ক্ষেত্রে ব্যাংক সাময়িক সময়ের জন্য নিজেই কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বছর শেষে শোধ করে। ব্যাংক যেহেতু খুব কম সুদে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে তাই হিসেবের সুবিধার জন্য আপাতত সুদের খরচ শূন্য ধরে অংক করছি।

৩য় বছর

- সওদাগর ও মণি মুক্তা তাদের ৩য় বছরের মোহর তুলে নিল মোট ২০০০ মোহর। সিন্দুকে জমা থাকলো ৬০০ মোহর।
- এই ৬০০ মোহর ব্যাংক জরিকে এক বছরের জন্য ঋণ দিয়ে দিল।
- ৩য় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে
২০০ (১ম বছরে সওদাগর ও মণি মুক্তোর নেয়া মোহরের সুদ) +
২০০ (২য় বছরে সওদাগর ও মণি মুক্তোর নেয়া মোহরের সুদ) +
২০০ (৩য় বছরে সওদাগর ও মণি মুক্তোর নেয়া মোহরের সুদ) +
৬০ (জরির দেওয়া সুদ) = ৬৬০ মোহর
- তাহলে, ৩য় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে
৬৬০ (৩য় বছরে পাওয়া মোট সুদ)
+ ৩০০০ (মণি ও মুক্তোর ফেরত দেয়া আসল)
+ ৬০০ (জরির আসল)
= ৪২৬০ মোহর

৪র্থ বছর

- সওদাগর তার ৪র্থ বছরের মোহর তুলে নিল ১০০০ মোহর

- সওদাগরকে ১০০০ মোহর দেয়ার পরেও ব্যাংকের কাছে রয়ে গেল ৩২৬০ মোহর। এবার সে এই মোহর ১ বছরের জন্য গরুখামারি রত্নাকে ঋণ দিয়ে দিল।

- ৪র্থ বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে

১০০ (১ম বছরে সওদাগরের মোহরের সুদ)
+ ১০০ (২য় বছরে সওদাগরের নেয়া মোহরের সুদ)
+ ১০০ (৩য় বছরে সওদাগরের নেয়া মোহরের সুদ)
+ ১০০ (৪র্থ বছরে সওদাগরের নেয়া মোহরের সুদ)
+ ৩২৬ (৪র্থ বছরে রত্নার নেয়া মোহরের সুদ)
= ৭২৬ মোহর

- তাহলে, ৪র্থ বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে

৭২৬ (৪র্থ বছরের পাওয়া মোট সুদ)
+ ৪০০০ (জহরত সওদাগরের ফেরত দেয়া আসল)
+ ৩২৬০ (রত্নার আসল)
= ৭৯৮৬ মোহর

এই হিসাবটা মেলানো হল একটা বাস্তব চিত্র উঠে আনার চেষ্টার অংশ হিসেবে। এর আগের মডেলে ৪০০০ টাকা খাটিয়ে ব্যাংক লাভ করেছিল ২৬০০ মোহর। এই মডেলে ব্যাংক এই ৪ বছরে তার কাছে থাকা ৪০০০ মোহরের বিপরীতে মোট ১৩,৮৬০ মোহর ঋণ দিয়েছে। আর সব মিলিয়ে ৩,৯২০ মোহর সুদ হিসেবে ফেরত পেয়েছে।

ব্যাংক তার মূলধন বা মূল ডিপোজিটের সাপেক্ষে ৩.৫ গুণ মোহর বেশি ঋণ দিয়েছে এবং চার বছরের রিটার্ন প্রায় ১০০%!

এর মাঝে ব্যাংক ১৬০০ মোহর ঋণ নিয়েছিল যা হিসেবের সুবিধার জন্য সুদমুক্ত ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু সেই ঋণের বিপরীতে ব্যাংক যদি ১৬০ মোহর সুদ দিয়েও থাকতো উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আসতো না।

চিন্তার খোরাক

- বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত বাজারে মোট ২৩৩৬.৭৬ বিলিয়ন টাকার নোট ছেড়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো ২০২১ সালে কিভাবে ১১৪১১.৪৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ দিয়েছে?

- আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ৫০০ টাকা ডিপোজিট রাখতে হয়। ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট ছিল প্রায় ১৩ কোটি ২৪ লাখ। তাহলে, ন্যূনতম কত টাকা এইসব অ্যাকাউন্টে ছিল আর ব্যাংকগুলো অনায়াসে কত টাকা 'হাওয়াই টাকা' হিসেবে ঋণ দিতে পেরেছিল?

ব্যাংক-টাকার অর্থনৈতিক মেকানিজম

আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, এভাবে হাওয়াই মুদ্রা সৃষ্টি করতে থাকলে ব্যাপক মূল্যস্ফীতি বা হাইপার ইনফ্লেশন হবে না? সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে, না, হবে না। কারণ, এই প্রক্রিয়ায় অর্থনীতিতে স্থায়ী 'মুদ্রা' না এনে, কেবল ঋণের বিপরীতে সাময়িক সময়ের জন্য হাওয়াই টাকা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে সব ঋণ সুদে আসলে ফেরত নেওয়া হচ্ছে। ঋণ দিলে যেমন হাওয়াই টাকা সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি ঋণ ফেরত নিলে হাওয়াই টাকার আসলটা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সুদটা রয়ে যায়। তাই হাওয়াই টাকার কারণে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে বড় কোনো সমস্যা হবে না।

হুট করে অতিরিক্ত পরিমাণ ঋণ বৃদ্ধি করলে মুদ্রাস্ফীতি শুরু হতে পারে। তবে ঋণ প্রদানের কিছুদিন বাদেই যেহেতু এই টাকা ফেরত নেওয়া হবে, অচিরেই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তবে একটি ব্যাংক চাইলেও ঋণের পরিমাণ হুট করে বাড়ানোর সুযোগ সীমিত, কারণ ব্যাংককে ঋণ প্রদান করার পূর্বে ঋণ নেবার গ্রহণযোগ্যতা বা ক্রেডিট রেটিং যাচাই করে নিতে হয় এবং অপাত্রে ঋণ দিলে লোকসান পোহাতে হয়।[১৬] সেজন্য এই প্রক্রিয়াতে হাইপার ইনফ্লেশন হবার সম্ভাবনা তেমন নেই।

এদিকে অর্থনীতিতে ঋণের পরিমাণ বাড়লে তার সাথে সাথে সুদের পরিমাণও বাড়ে। সুদের টাকা ব্যাংকের কাছে আসতেই ব্যাংক নতুন করে ঋণ দিয়ে দেয়। এভাবে যতদিন পর্যন্ত ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে, ততদিন কোনো সমস্যা হয় না (কেবল মূল্যস্ফীতি চলতে থাকে)। তবে যখনই ঋণ নেওয়ার বেগ কমে আসে, ঋণ পরিশোধ করার জন্য টাকা নিয়ে টানাটানি শুরু

১৬ আধুনিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি খুব উদার হস্তে টাকা বিলি করতে থাকে, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি হবে। তবে এই সমস্যাটিও সাময়িক সময়ের জন্য হবে কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে দান করে না বরং ঋণ দেয় এবং পরবর্তীতেই তা সুদে আসলে ফেরত চায়। আর ঋণ ফেরত আসা মানেই টাকা 'নাই হয়ে যাওয়া'। অর্থাৎ, ক্রমাগত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না থাকলে মুল্যস্ফীতি হবে না।

হয়ে যায়। প্রতিযোগিতায় যারা টিকতে পারে না তারাই দেউলিয়া হয়ে যায়। এই দেউলিয়াপনা থেকে জাতিকে রক্ষার উপায় কি? আরও অধিক ঋণ গ্রহণ!!

> *'Thus, our national circulating medium is now at the mercy of loan transactions of banks, which lend, not money, but promises to supply money they do not possess.'*
>
> *– Irving Fisher*
> *American Neoclassical Economist, Statistician & Inventor*

> *'অর্থাৎ আমাদের জাতীয় মুদ্রা সরবরাহ ব্যাংকের ঋণপ্রবাহের দয়ার উপর চলছে, যারা (ব্যাংক) প্রকৃতপক্ষে কোনো টাকা দেয় না। বরং তারা টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যা তাদের নিজেদের কাছেও নেই।*
>
> *– আরভিন ফিশার*
> *অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ এবং উদ্ভাবক*

> *'I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.'*
>
> *– Thomas Jefferson*
> *Founding Father & 3rd President of the USA*

> *'আমি বিশ্বাস করি আমাদের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদেশী সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি বিপদজনক হচ্ছে ব্যাংকব্যবস্থা।'*
>
> *– থমাস জেফারসন*
> *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ও ৩য় প্রেসিডেন্ট*

সমাজব্যবস্থা

একবার পিছন ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পারব, আমরা কতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। প্রথমে মুদ্রার সংখ্যা ছিল স্থির, ছিল না কোনো বৈষম্য, অর্থনীতি ছিল স্থবির, সব সুদ ছিল সরল, ছিল না কোনো হাওয়াই টাকা।

প্রথমে আমরা বৈষম্যময় ও প্রবৃদ্ধির অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছি। তারপর মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিরতার শর্ত তুলে নিয়েছি এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাব্যবস্থার সূচনা করেছি। তার পরবর্তীকালে সংযুক্ত করা হয়েছে চক্রবৃদ্ধি সুদ। সবশেষে আমরা মুদ্রা তৈরি করার বাঁধও তুলে নিয়েছি। এভাবে কাঠামোটি বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কিন্তু ক্রেডিট মানি আবিষ্কারের ফলে অর্থনৈতিতে কী কী পরিবর্তন এসেছে? ধরা যাক, রামিম ব্যাংকই ক্রেডিট মানি নিয়ে এসেছে। এখন কি পরিবর্তন আসবে তা জানতে রূপসাগরের তীর থেকে ভ্রমণ করে আসা যাক।

নতুন মুদ্রা তৈরির করার ফলে রামিম ব্যাংক অত্যন্ত ব্যবসাবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। কেউ ব্যবসায় বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ নিতে আসলে ব্যাংক সহজে তাকে ফিরিয়ে দেয় না। দ্বীপে আর কারো কাছে খুঁজে মুদ্রা পাওয়া যাক বা না যাক বিপদের দিনে ব্যাংকের কাছে গেলে মুদ্রা পাওয়া যায়ই। এভাবে ব্যাংক নিজেকে সব ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের সাহায্য প্রাপ্তির শেষ স্থল হিসেবেও ব্যাংক সবার কাছে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। সব মিলিয়ে ব্যাংক এখন অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এদিকে সবাইকে 'সাহায্য' করতে পেরে ব্যাংকও বেজায় খুশি। কারণ, সবাই যত ঋণ দিচ্ছে, ব্যাংকের ততই লাভ হচ্ছে। তাছাড়া, টাকা এখন যেহেতু হাওয়া থেকেও আসে, নতুন টাকা সৃষ্টি করে ধার দেওয়া কোনো সমস্যাই না। বরং নতুন ঋণ, নতুন টাকা সৃষ্টির দরজা খুলে দিচ্ছে ব্যাংকের জন্য।

নতুন নতুন টাকা সৃষ্টি করাতে সবার হাতে হাতে আগের চেয়ে বেশি বেশি টাকা আসছে – ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা এখন আগের তুলনায় সহজ হয়ে গিয়েছে। কারণ, সবার হাতে বেশি বেশি টাকা আসা মানে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হাতেও বেশি টাকা আসা। তবে সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে বিনিয়োগকারীরা। তারা নতুন কোনো প্রকল্প হাতে নিতেই ব্যাংক থেকে সরাসরি টাকা পাচ্ছে। আগের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পুঁজি সংগ্রহ করতে হচ্ছে না। ব্যাংকের কাছে অনেক টাকা থাকে দেখে ব্যাংক নিজেও ঋণ দিতে ইচ্ছুক। ঋণের সহজলভ্যতার ফলে সবাই বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন ব্যবসা উদ্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চারদিকে বইছে উন্নয়নের সুবাতাস।

এদিকে সবকিছুর দাম বাড়তি থাকায় সাধারণ মানুষ যেমন একদিকে একটু চাপের মুখে আছে, তেমনি জমি, ঘর-বাড়ি ইত্যাদির দাম বাড়তি থাকায় তারাও আরেকদিক দিয়ে খুশি। একটা স্বাবলম্বী সমাজে আসলে কেউই নিঃস্ব না, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু থাকে, সেজন্য সবাই হিসেব করে দেখছে তারা এখন আগের তুলনায় বেশি ধনী – তাদের জমিজমা, ঘরবাড়ি সবকিছুর মূল্যই এখন বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। স্থায়ী সম্পত্তির দাম বাড়ায় অধিবাসীদের মধ্যেও একটা হামবড়া ভাব এসে গেছে। সবাই নিজেকে আগের তুলনায় বড়লোক মনে করছে।

এই সিস্টেমের প্রভাবে চারপাশে দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের ছড়াছড়ি। সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ায় সবাই নতুন নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে। যেদিকে চোখ যাবে

সেদিকেই নজরে পড়বে খোঁড়াখুঁড়ি এবং অবকাঠামো নির্মাণের চিহ্ন। যে যেভাবে পারছে সেভাবে বিনিয়োগ করে লাভ হাতিয়ে নেওয়ার চিন্তা করছে। কেউ বন উজাড় করে নতুন নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোগ নিচ্ছে, কেউ কৃষিপণ্য নিয়েও ব্যবসা করছে, কেউ আবার শিক্ষা নিয়েও ব্যবসা করছে। এককথায় জীবনের তন্নে তন্নে ব্যবসায়ী চিন্তা প্রবেশ করেছে।

অধিক মুদ্রাপ্রবাহের কারণে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে গেছে। এখন অবস্থা এমন যে চাকরি বা ব্যবসা ছাড়া ভালোভাবে চলা অসম্ভব। দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যেও একটা হামবড়া ভাব এসে গেছে। এখন আর সেই শান্তস্নিগ্ধ কৃষিভিত্তিক জীবন নেই। সব কিছু বদলে গেছে।

এবারে বিষয়গুলো ব্যাংকের দিক থেকে দেখা যাক। ব্যাংক জানে কিভাবে তার ঋণ ব্যবসা চলে, কিভাবে নতুন মুদ্রা সৃষ্টি হয় এবং নতুন মুদ্রা সৃষ্টির ফলে কিভাবে ব্যাংকের ব্যবসা বড় হয়। নতুন মুদ্রা যে কেবল ব্যাংকের জন্য ভালো, তা নয়। এই পর্যায়ে দ্বীপবাসীর জন্যও তা দরকারি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কারণ, নতুন মুদ্রা না আসলে তারা পুরানো ঋণের সুদ পূরণ করতে না পেরে প্রতিনিয়ত দেউলিয়া হতে থাকবে। ব্যাংক চাইলেই মুদ্রা সৃষ্টি বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু তা ব্যাংকের জন্য ক্ষতিকর, আবার জনগণের জন্যও ক্ষতিকর। তার চেয়ে ভালো উন্নয়নের ধারা চালিয়ে যাওয়া। এতে সবাই ভালো থাকবে। তাই ব্যাংক ঋণ নিতে সবাইকে খুব উৎসাহিত করে। বাদবাকি সবাইও এখন ঋণ নিতে উৎসাহিত করছে। 'উন্নতি' কে না চায়!

এদিকে যারা বিনিয়োগ করে সফল হয়েছে তাদের মাঝে অনেকে বিপুল সম্পদশালী হয়ে গেছে। আবার একই সময়ে কিছু ব্যক্তি সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। যারা সব হারিয়েছে, তারাই চাকরীজীবী হিসেবে শিল্পপতির অধীনে নিযুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। ফলে চাকরি দাতা এবং চাকরি প্রার্থীর বিকাশ ঘটেছে। আগের স্বাবলম্বী দিন আর নাই। সবাই নিজেকে চাকুরি দাতা হিসেবে দেখতে চান কিন্তু বেশিরভাগ ব্যক্তিই চাকরি প্রার্থী হিসেবে জীবন পার করে দেন। সামাজিক অবস্থা এখন এমন যে সবাই কেবল ধনী হবার স্বপ্নে বিভোর। যেই সোনার নেশায় রিবা এককালে সুদের ব্যবসা শুরু করে, সেই নেশা এখন সবার মাঝে বিরাজমান। মুদ্রার প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসাই সমাজের সবচেয়ে বড় মহামারি ব্যাধি। বাতাসে ভাসছে স্বার্থ ও পুঁজিবাদের তীব্র গন্ধ। আগের দিন আর নেই। এখন মানুষ মানুষকে চিনে না,

চিনে কেবল টাকাকে। সবাই বুঝে নিজ স্বার্থ এবং সব জায়গায় খুঁজে নিজের সুবিধা। অথচ সাবাই দিন রাত পরিশ্রম করে যা অর্জন করে তার সব পরোক্ষ ভাবে ব্যাংককেই ধনী করছে।

সরকার

সহজ ঋণ এবং বিনিয়োগের কল্যাণে পরিবর্তনের ছোঁয়া এখন সবখানে। তবে একটি সমস্যা হচ্ছে, এই পরিবর্তন হয়েছে খুবই অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খল। দ্বীপে এখন আগের মতো গাছপালা, খেলার মাঠ ও বিশুদ্ধ পানির উৎস নেই। আগের পায়ে হাঁটার রাস্তায় এখন এত ভারি মালপত্রে বোঝাই বাহন চলছে। এখন এই বর্ধিত কলেবরের অর্থনীতি ও কর্মকাণ্ড সবকিছু নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন সঠিক নির্দেশনা এবং এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন একটা সরকার। তাই এখন থেকে দ্বীপ সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হলো।

সরকারের সবার থেকে চাঁদা (ট্যাক্স) নিবে এবং এই টাকা দিয়ে দ্বীপের অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা আরো উন্নত করা হবে যাতে আরো ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও নতুন নতুন বিনিয়োগ হয়।

দ্বীপে উন্নয়নমূলক সরকার আসা ব্যাংকের জন্যে বি-রা-ট সুসংবাদ। বেশি বেশি ব্যবসার প্রসার হলে এবং বিনিয়োগ হলে ব্যাংক বেশি বেশি ঋণ দিতে পারবে। তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এখন থেকে ব্যাংক সরকারকে ঋণ দিতে পারবে এবং সরকার জনগণের ট্যাক্সের টাকা তুলে পই পই করে এই ঋণ সুদসমেত পরিশোধ করবে। যত উন্নয়ন, তত ঋণ আবার যত ঋণ তত উন্নয়ন। সব মিলিয়ে সরকার উন্নয়নের জপমালা টিপছে এবং সরকারের দেখাদেখি বাকিরাও এই কাজ শুরু করে দিয়েছে। এইটা ছাড়া বাঁচার আর কোনো উপায় নেই।

সরকার আসার আরেকটি সুবিধা হলো, এখন কেউ ঋণ ফেরত না দিলে মহাজনকে ব্যক্তিগত লাঠিয়াল বাহিনী ব্যবহার করতে হয় না। সরকার নিজ দায়িত্বে আইনি প্রক্রিয়ায় সেই ব্যবস্থা করে দেয়। সরকারের পুলিশ বাহিনী ব্যাংক কে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দেয়, তাই চুরির ভয়ও কম। ব্যাংকের জন্য সবদিক থেকেই লাভ। একদিকে জনগণের টাকায় ব্যাংক ধনী হচ্ছে আবার তাদের ট্যাক্সের টাকাতেই ব্যাংক নিরাপত্তা লাভ করছে। এমনকি অর্থনৈতিক বৈষম্যে ক্ষুব্ধ হয়ে সবাই ব্যাংকের উপর আক্রমণ করতে গেলে জনগণের সরকারই তা প্রতিহত করছে। সব মিলিয়ে দ্বীপ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ব্যাংকের জন্য কাজ করার খুব ভালো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং ইমেজ পরিষ্কার থাকছে।

বিনিয়োগের বৃদ্ধির ধারা সবসময় অব্যাহত রাখতে পারলে খুবই চমৎকার হয় কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি সীমা আছে। একটি পর্যায়ের পর বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার কমে আসবে। কিন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে না পারলে নতুন টাকা (ঋণ) তৈরি হবে না এবং নতুন টাকা তৈরি না হলে পুরানো ঋণের সুদ পূরণ হবে না। তাই অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়ে যাবে।

এই মন্দা বা মহামন্দা থেকে বের হবার উপায় হচ্ছে অর্থনীতিতে নতুন টাকার প্রবেশ করানো। ব্যাংক যেহেতু টাকা ছিটিয়ে ছিটিয়ে দান করে না, নতুন টাকা প্রবেশ করাতে ঋণের পরিমাণই বৃদ্ধি করতে হবে। এই ঋণ যে কেবল বিনিয়োগ আকারেই আসতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। বেশি মানুষকে ঋণের আওতাভুক্ত করতে গৃহ ঋণ, কৃষি ঋণ, শিক্ষা ঋণ ইত্যাদি আনা শুরু করবে ব্যাংক। এই ঋণগুলো নিতে হবে সবার। অন্যথায় কেউই ভালো থাকবে না। এই সব কিছুর পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ঋণের আওতাভুক্ত করতে নতুন স্কিম চালু করবে ব্যাংক, যার নাম দিবে এসএমই (small and medium enterprise)।

নতুন স্কিম দেখে অধিবাসীরা প্রথমে ইতিস্তত বোধ করতে পারে। এই জড়তা দূর করতে ব্যাংক পণ্যের প্রচার করবে, এজেন্ট নিয়োগ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠাবে। সমাজে যাদের কথা মানুষ গুরুত্ব দেয়, বিশ্বাস করে, ভালবাসে তাদেরকে বিজ্ঞাপনের মডেল বানাবে। আবার ইতিমধ্যেই যারা ধনী হয়ে আরামদায়ক জীবনযাপন করছে তাদের দেখাদেখি সবাই আরামদায়ক জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখবে। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে অনেকেই ঋণ নিবে।

এতদিন মানুষ উন্নয়ন দেখেছিল কেবল আশেপাশে এখন সেই ধারা ঘরে ঘরে চলে আসছে। মানুষ নতুন নতুন বাড়ি তৈরি করছে, গৃহস্থালি পণ্যও ঋণে কিনছে। সবখানে উন্নতির ছোঁয়া। যেই ঘর কিছুদিন আগে ছিল এলাকায় সেরা, অচিরেই তা হয়ে যাচ্ছে গর্ব করার অনুপযোগী।

এত কিছুর পরও ঋণে জর্জরিত হওয়ার একটা সীমা আছে। কিন্তু যতবারই অর্থনীতি সেই সীমানায় পৌঁছেছে, নতুন একটা না একটা উপায় ব্যাংক বের করেছে। ব্যাংকের হিসেবে সে চায় সবাই ভালো থাকুক আর সুদের এই অর্থনীতিতে সবার ভালো থাকার জন্য প্রয়োজন আরো অধিক ঋণ নেয়া। এবার নতুন এই সীমানা অতিক্রম করতে ব্যাংক আরেকটা নতুন পণ্য

নিয়ে এসেছে। আর তা হচ্ছে ভোক্তা ঋণ। মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এমনকি মুদি দোকানের কেনাকাটা পর্যন্ত ব্যাংক ঋণে করতে পারবে এবং তা মুদ্রায় না করে ক্রেডিট খাতার মাধ্যমে করতে পারবে।

দ্বীপের সব বদলে গেছে। কিভাবে সব বদলালো, কেন বদলালো, কেউ জানার সময় পেল না। তবে সবাই একটি কথা জানে, ঋণ ছাড়া চলা অসম্ভব। আরও একটা কথা জানে। দ্বীপবাসীরা আগের চেয়ে অনেক উন্নত জীবনযাপন করছে কিন্তু পুরানো স্বাধীন, বৈষম্যহীন সমাজ আর নেই। সব অধিবাসী কিছু শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের হাতে জিম্মি। এই পুরা ব্যাপারকে আমরা এক শব্দে বলি 'আধুনিক সুদ-ভিত্তিক পুঁজিবাদ'।

আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সুদের বীজ খুব সুন্দর একটি দ্বীপে কিছু ব্যক্তির পারস্পরিক লেনদেন দিয়ে শুরু হয়ে কিভাবে এর প্রভাব সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করল।

'Money is a new form of slavery, and distinguishable from the old simply by the fact that it is impersonal Ñthat there is no human relation between master and slave.'

– Leo Tolstoy
Legendary Russian Writer

'অর্থ হল দাসত্বের নতুন রূপ। তবে একটাই পার্থক্য, আগে দাসের সাথে মালিকের ব্যক্তিগত একটি সম্পর্ক ছিল কিন্তু এখন আর সেই সম্পর্ক নেই।'

– লিও তলস্তয়
জগদ্বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক

'I am afraid that the ordinary citizen will not like to be told that the banks can and do create and destroy money. And they who control the credit of a nation direct the policy of governments, and hold in the hollow of their hands the destiny of the people.'

– Reginald McKenna
British Banker & Politician

'ব্যাংক নিজেই টাকা তৈরি করতে পারে ও তারা টাকা তৈরি করে এবং তারা ইচ্ছেমত টাকা ধ্বংসও করে, আমার ধারণা, যদি জনগণকে এই ব্যাপারটা জানানো হয়, তাহলে তারা এটা ভালভাবে নিবে না। আর একটি দেশে যারা এই অর্থের জোগান নিয়ন্ত্রণ করে, তারা আসলে দেশের সরকারের সকল নীতি নির্ধারণ করে এবং তাদের হাতের মুঠোতেই জাতির ভাগ্যকে কব্জাগত করে রাখে।

– রেজিনাল্ড ম্যাককেনা

ব্রিটিশ ব্যাংকার ও রাজনীতিবিদ

'None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.'

—Johann W. Goethe

Legendary German Poet, Playwright, Novelist, Scientist & Statesman

'যে পরাধীন থাকার পরেও নিজেকে স্বাধীন ভাবে, সে সবচেয়ে ভয়ংকর ধরনের পরাধীনতায় নিমজ্জিত।'

— জোয়ান ডব্লিও গ্যটে

বিখ্যাত জার্মান কবি, নাট্যকার, উপন্যাসিক, বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ

বিভিন্ন অর্থব্যবস্থা

আমাদের বর্ণনা দেখে মনে হতে পারে যে এই বইয়ে আধুনিক বিশ্বের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সুদভিত্তিক অর্থনীতি এই দুটি বিষয় গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। খেয়াল করে দেখবেন, এখানে সতর্কভাবেই সমাজে কোনো প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রসঙ্গ নিয়ে আসা হয়নি। এটা দেখানো হয়নি যে, দ্বীপে আগে ঘোড়ার গাড়ি চলতো এখন চলছে ইঞ্জিনের গাড়ি। এমন বলা হয়নি যে অধিবাসীরা লোহার ব্যবহার শিখেছে, বিদ্যুৎ সংযোগ এনেছে, কম্পিউটার এনেছে, ইন্টারনেট, ডিজিটাল কারেন্সি কিংবা নতুন নতুন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এক কথায় নতুন কোনো প্রযুক্তিই আসেনি। মোটাদাগে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সব আগের মতই আছে। যা এসেছে তা হল সুদভিত্তিক অর্থনীতি আর সেই অর্থনীতিকে চালাতে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি। এটাও ধরে নিতে পারেন, ব্যাংকের দেয়া সেই 'রিসিট' আসলে তালপাতার উপর কয়লার কালিতে লেখা পত্র। বর্তমান পুঁজিবাদ হল সুদভিত্তিক অর্থনীতির সুন্দর একটি অপর নাম। এর সাথে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, জ্ঞানবুদ্ধি, কম্পিউটার সিস্টেম, সভ্য সমাজ ব্যবস্থা কিছুরই সম্পর্ক নেই।

আরেকটা কথা মনে রাখা জরুরি, সুদভিত্তিক অর্থনীতির বিরোধিতা মানে সমাজতন্ত্রের সমর্থন করা না। বর্তমান পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদের মাঝে আমাদের চিন্তা আটকে গেছে দেখে একটি বাক্সের বাহিরে যেতে পারছি না। চিন্তা করে বলুনতো, সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামল কি পুঁজিবাদী না সমাজবাদী ছিল? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। কারণ, এই দুইয়ের বাহিরেও জগত আছে।

অনেকে আবার ভুল করে মন্তব্য করে ফেলতে পারে যে, ইসলামী অর্থনীতি মানেও পুঁজিবাদ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান পুঁজিবাদের বিরোধিতা করা মানে ইসলামেরও বিরোধিতা করা। দাবিটা একেবারেই সঠিক না। ভালভাবে পড়াশোনা করে ও ইতিহাস জেনে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন, আবু বকর রা. এর শাসনামল কি পুঁজিবাদী ছিল? শ্রেণীবৈষম্য এবং অর্থনৈতিক শোষণে ভরা ছিল? সেই যুগের মানুষের চিন্তা, সমাজ আর অর্থনীতি কি বর্তমান সময়ের মত ছিল?

সবশেষে, বর্তমান পুঁজিবাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়া মানে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং ব্যক্তি মালিকানার বিরোধিতা করা না। মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং ব্যক্তি মালিকানার বিকাশ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা মুক্তবাজার, লেসে ফেয়ার অর্থনীতি এবং সুদ একত্রে চাল ডালের মত মিশিয়ে এই খিচুড়ির নাম দিয়েছি পুঁজিবাদ। ফলে আমাদের সমীকরণটি দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ :

উন্মুক্ত বাজার + ব্যক্তি মালিকানা + সুদ = আধুনিক পুঁজিবাদ

উপরের সমীকরণ থেকে সুদকে বাদ দিলে আমরা পাব সুদ মুক্তবাজার-অর্থনীতি। তখন সমীকরণটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ :

উন্মুক্ত বাজার + ব্যক্তি মালিকানা = বাজার-অর্থনীতি (বা সুদমুক্ত পুঁজিবাদ) / Market Economy

প্রথম সমীকরণের সাথে করভিত্তিক সমাজকল্যাণ যুক্ত করলে আমরা পাব কল্যাণ অর্থনীতি।

উন্মুক্ত বাজার + ব্যক্তি মালিকানা + সুদ + সমাজকল্যাণ (করভিত্তিক) = কল্যাণ অর্থনীতি

এবার দ্বিতীয় সমীকরণের বাম পাশে জাকাত এবং অনুদানভিত্তিক সমাজ কল্যাণ যুক্ত করে দিলে আমরা ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা পাব)

উন্মুক্ত বাজার + ব্যক্তি মালিকানা + সমাজকল্যাণ (যাকাত এবং অনুদান) = ইসলামী অর্থনীতি

অর্থাৎ, ইসলাম মানে বর্তমানের এই সুদভিত্তিক বৈষম্য উৎপাদনকারী পুঁজিবাদ কথাটি একেবারেই সঠিক নয়। ইসলাম মানে সঠিক মুদ্রাব্যবস্থার ভিত্তিতে সুদমুক্ত বিনিয়োগ দ্বারা পরিচালিত মুক্তবাজার অর্থনীতি, যেখানে রয়েছেন ব্যাপক সমাজকল্যাণ (জাকাত এবং অনুদান)।

চিন্তার খোরাক–

- ব্যাংক ছাড়া একটি অমুসলিম রাষ্ট্র কি কোনোদিন চলতে পারবে?
- ব্যাংকিং ব্যবস্থার সমাধান কেমন হওয়া উচিত?

> 'Sound money and free banking are not impossible, they are merely illegal.'
>
> – Hans F. Sennholz
> American-Austrian Economist & Author

> 'ন্যায্য মুদ্রা এবং মুক্ত-ব্যাংকিং ব্যবস্থা অসম্ভব নয় বরং এটি এক প্রকার নিষিদ্ধ।'
>
> – হ্যান্স এফ. সেনহোলজ
> আমেরিকান-অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ ও লেখক

সপ্তম অধ্যায়

চেকের প্রবর্তন

এই পর্যন্ত আমরা পড়ে ছিলাম একেবারে কাঠের তক্তা আর সিন্দুকের যুগে, যেখানে সবাই হাতেহাতে লেনদেন সম্পন্ন করে – না ছিল কোনো চেকের ব্যবহার, না ছিল ডেপজিট স্কিম বা কাগুজে মুদ্রা। এবার চলুন একটু একটু করে সেই প্রযুক্তিগত উন্নয়নগুলো ঘটাই।

আমরা আমাদের চিন্তার বাঁধ (সেটিরাস পেরিবাস) গুলো একটি একটি করে দূর করে সমাজ জীবনে ব্যাংক এবং সুদের প্রভাব দেখেছি? এবার আমরা দেখবো ব্যাংকিং খাতে নতুন নতুন প্রযুক্তির কল্যাণে আমাদের অর্থনীতিতে কী কী পরিবর্তন সংগঠিত হয়।

প্রথমত, ব্যাংকিং সেক্টরের যুগান্তরী আবিষ্কার চেকে লেনদেন দিয়ে শুরু করা যাক। চেকে লেনদেন হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা স্বাক্ষর করেই মুদ্রার মালিকানা পরিবর্তন করে দেওয়া যায়, হাতে হাতে লেনদেন করতে হয় না। সর্বপ্রথম চীনে ৯ম শতাব্দীর দিকে চেকের ব্যবহার শুরু হয়। বাণিজ্য খাতে চেকে লেনদেন অত্যন্ত সুবিধাজনক দেখে এর ব্যবহার ধীরে ধীরে ইউরোপে এবং পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

চেকে লেনদেন করলে গ্রাহকদের কষ্ট অনেক কমে যায়। এর আরেকটি উপকারী দিক হল, এই লেনদেন খুব নিরাপদ। চেক লিখে দিলে নিজের সাথে টাকা বহন করে চলতে হয় না। অ্যাকাউন্টের হিসেব পরিবর্তনের মাধ্যমে চোখের নিমিষে খুব সহজেই লেনদেন কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

এবারে ব্যাংকারদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখা যাক। প্রথমত, চেক ব্যবস্থা ব্যাংকের জন্যও লাভজনক। কারণ চেকে লেনদেন করলে ব্যাংকের ভেতরেই এক অ্যাকাউন্ট থেকে আরেক অ্যাকাউন্টে মুদ্রা চালান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, সিন্দুকের মুদ্রা সিন্দুকেই পড়ে থাকে, কেবল হিসাব খাতায় নাম এবং নাম্বার বদলায়।

চেক ব্যবহারে একজন ব্যাংকারের জন্য সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে যারা ঋণ নিয়েছে তারা টাকা তুলতে আসে না এবং মহাজন নিরাপদে অদৃশ্য টাকার উপর সুদ অর্জন করতে থাকে। এভাবে আরো বেশি পরিমাণে হাওয়াই/ অদৃশ্য মুদ্রা তৈরি করতে পারে।

এই প্রভাবগুলো ভালো করে বুঝতে রূপনগর রাজ্য ভ্রমণ করে আসা যাক।

রূপনগর রাজ্যটির অর্থনীতি সবদিক থেকে রূপসাগরের মতোই। একটিই মাত্র ভিন্নতা। রূপনগরে চেক আছে, রূপসাগরে চেক নেই। অর্থাৎ, এই পর্যন্ত আলোচনা করা অর্থনৈতিক কাঠামোর সবটাই রূপনগরে আছে এবং তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে একটি মাত্র ব্যাংকিং প্রযুক্তি, চেক। চেক যেহেতু মধ্য যুগের আবিষ্কার, আমরা ধরে নেই রূপনগরের মুদ্রা হচ্ছে সোনার মোহর।

রূপনগরে 'মায়া' নামে একজন তরুণ ব্যাংকার বসবাস করে। ব্যবসার শুরুতে মায়ার পুঁজি ছিল ১,০০০টি মুদ্রা। প্রেম কুমার এসে মায়ার কাছে ২,০০০টি মুদ্রার ঋণ চাইল এবং সোহাগ চাইল ১,০০০টি মুদ্রা। মায়া হাওয়াই টাকার হিসাব বুঝে। তাই সে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী হিসাব খাতায় প্রেম কুমারের নামে ২,০০০টি মুদ্রা এবং সোহাগ ব্যাপারির নামে ১,০০০টি মুদ্রা ঋণ লিখে দিল। এভাবে মাত্র ১,০০০টি মুদ্রার বিপরীতে মায়া তাদের দুই জনের ডেপজিট অ্যাকাউন্টে মোট ৩০০০টি মুদ্রা জমা দেখিয়ে দিল (ঋণ হিসেবে)। যার যখন ইচ্ছা তখন এই মুদ্রা তুলে নিয়ে খরচ করতে পারবে, এবং সুদ পরিশোধ করতে থাকবে।

প্রথমে প্রেম কুমার দোকান তৈরির উদ্দেশ্যে গ্রামের গৃহস্থ প্রীতির কাছ থেকে ১,০০০টি মুদ্রার কাঠ ক্রয় করল। প্রেম ব্যাংকের থেকে মুদ্রা তুলে হাতে দেবার কথা উঠলেই প্রীতি বলল, 'আমার বাসা থেকে যদি চুরি হয়ে যায়? আমি কেন এত ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন করব? আবারতো কষ্ট করে সেই ব্যাংকেই জমা দিতে হবে। আপনি বরং চেক লিখে আমার অ্যাকাউন্টে তা পাঠিয়ে দিন। সবার জন্যই ভালো হয়।' প্রেম কুমার সব শুনে খুশি হলো। সে নিজেও সিন্দুক থেকে মুদ্রা তুলে নিয়ে প্রীতির হাতে তুলে দেয়ার মত ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিল না।

এদিকে চেক হাতে পেয়ে মায়া প্রীতির নামে ১,০০০টি মুদ্রা জমা লিখে দিল এবং প্রেম কুমারের নাম থেকে ১,০০০টি মুদ্রা বিয়োগ করে দিল। আর সিন্দুকের ১,০০০টি মুদ্রা জায়গাতেই পড়ে রইল। ডালা খুলবারও প্রয়োজন পড়ল না।

এবার সোহাগ ব্যাপারি প্রীতির কাছ থেকে ৫০০ মোহরের ধান ক্রয় করতে ব্যাংকে চেক পাঠিয়ে দিল। মায়া সেই মোতাবেক সোহাগ ব্যাপারির অ্যাকাউন্ট থেকে ৫০০ মোহর বিয়োগ করে প্রীতির অ্যাকাউন্টে ৫০০ মোহর যোগ করে দিল। এদিকে আবার নতুন বাড়ি করতে আদরের থেকে প্রীতি ৩০০ মোহরের কাঠ, ছন ও আসবাবপত্র কিনে রাখলো চেক বিনিময় করে।

অর্থাৎ, সব মিলিয়ে হিসেব এমন–

আদরের জমা ৩০০ মোহর এবং কোনো ঋণ নেই

প্রীতির জমা ১,২০০ মোহর এবং কোনো ঋণ নেই

প্রেম কুমারের মোট ঋণ ২০০০ মোহর, জমা ১০০০ মোহর এবং ব্যয় ১০০০ মোহর।

সোহাগ ব্যাপারির মোট ঋণ ১০০০ মোহর, জমা ৫০০ মোহর এবং ব্যয় ৫০০ মোহর।

এখন পর্যন্ত সিন্দুকের ডালা খোলা লাগেনি অথচ বছর শেষে আসছে প্রচুর পরিমাণ সুদ। এই হলো চেকের ম্যাজিক।

অনেকে বলতে পারেন সিন্দুকের মোহর যেহেতু নাড়ানোই লাগেনি চুপিসারে অপর কোনো ব্যক্তি যেমন– দরদী'কে ১০০০টি মুদ্রা ঋণ দিয়ে দিলেই তো হয়। সেইটা অসম্ভব না, তবে জরুরি প্রয়োজনের জন্য কিছু মোহর হাতে রাখা উচিত। একটি রাজ্য শতভাগ ক্যাশবিহীন লেনদেন হয় না। তাই কিছু মুদ্রা উত্তোলিত হয়। আর ভবিষ্যতে যদি এমন একজনের সাথে লেনদেন করতে হয় যার কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টই নেই, সেক্ষেত্রে চেকে লেনদেন করাও অসম্ভব।

এরূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করতেই হবে এবং সিন্দুকের মোহরের চাহিদাও থাকবে। তাই জরুরি সোনা জমা না রাখলে বিপদের দিনে ব্যাংককে পরের কাছে ঋণের জন্য হাত পাততে হবে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে গ্রাহকদের 'পরে আসেন' বলে ফিরিয়ে দিতে হবে। বার বার এমন করলে সবাই সন্দেহ করতে থাকবে, এবং সিন্দুকের সব সোনা তুলতে আসবে। তখন ব্যাংক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। তাই জরুরি ভিত্তিতে কিছু মুদ্রা জমা না রেখে উপায় নেই।

রাজ্যে যদি সবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতো এবং চেকে লেনদেন করত, তাহলে ক্যাশলেস অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হত এবং এই গল্প ছবির মতই মিলে যেত। মায়াও নিশ্চিন্তে ঋণ বাড়াতে থাকত এবং সুদ তুলতো। কিন্তু আমরা যেহেতু এখনও আমাদের কাঠামোটি মধ্যযুগে রেখেছি, রাজ্যে কেবল বড় বড়

ব্যবসায়ী লেনদেন চেকে হবে এবং ছোট লেনদেন মোহরে হবে এমনটিই ধরে নেই।

টীকা - ব্যাংকের কারসাজি

ইস্ট পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংকে ১০০ কোটি রূপি আছে আর এর পুরোটাই ব্যাংকের নিজের মূলধন। সে এখনো কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে 'ডেপোজিট' নেয়া শুরু করেনি। এখন, দেখা গেল আদমজী জুট মিল ঋণ চেয়েছে ১০০ কোটি রূপি আর চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি ঋণ চেয়েছে ১০০ কোটি রূপি। ব্যাংক ২জনকেই ১০০ কোটি করে মোট ২০০ কোটি রূপি ঋণ দিল। ব্যাংক শর্ত দিল যে, যারা ঋণ নিবে, ঋণের রূপি খরচের জন্য যাদেরকে দিবে তাদের অ্যাকাউন্ট ইস্ট পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংকে থাকতে হবে। এত সহজ শর্তে কে না ঋণ চায় বলেন? সুতরাং তারা রাজি। এবার দেখা গেল, এই দুই প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩০০ সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে পণ্য ও সেবা কিনবে, তারা সবাই এই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করবে আর ঋণ নেয়া সংস্থা এই নতুন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে চেকে লেনদেন করবে।

এতে করে দেখা যাবে, রূপির একটা বড় অংশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেই থেকে যাচ্ছে, আর বাইরে থেকে শ্রেফ চেক বদলের মাধ্যমে রূপির মালিকানা পরিবর্তন হচ্ছে।

এবার ব্যাংক বলল যে আপনারা আপনাদের কর্মকর্তার বেতন 'স্যালারি অ্যাকাউন্ট' এর মাধ্যমে দেয়া শুরু করুন। তখন, আদমজী জুট মিল আর চট্টগ্রাম বন্দরের সব কর্মকর্তাসহ বাকি আরো ৩০০ সংস্থার বেশিরভাগ কর্মকর্তা, ধরলাম প্রায় ৭০০ জনের স্যালারি তাদের নতুন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে আসা শুরু করল। তাহলে দেখা গেল, শ্রেফ চেক সুবিধার কারণেই ব্যাংক নতুন ১০০০ অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ফেলল। সবাই তাদের জমা করা রূপির ১০% অ্যাকাউন্টে রেখে দিলেও ব্যাংকের কাছে একটা মোটা অংকের রূপি জমা থাকল।

ব্যাংক যাদেরকে ঋণ দিয়েছে, তাদের হিসাব মতে ব্যাংকের কাছে আছে মোট ২০০ কোটি রূপি। কিন্তু যেহেতু ব্যাংকের ভল্ট তালাবদ্ধ, তাই কেউ বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে। তারা যখন এই ঋণের টাকা খরচ করে, তখন ঘুরেফিরে টাকা একজনের অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকজনের অ্যাকাউন্টে যায়। আর যদি তারা পরস্পর চেকে লেনদেন করে নিজেদের মধ্যে, ভল্টের মুদ্রা ভল্টেই পড়ে থাকে, কেবল হিসাব খাতায় নাম এবং নাম্বার বদলায়। সবাই

মনে করছে যার যার রূপি ব্যাংকের ভল্টে নিরাপদে আছে। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে হিসেব দেখানো হচ্ছে ২০০ কোটি রূপির, ভল্টে এতো মুদ্রা নেই।

এখানে, ব্যাংক তার মূলধনের ২ গুন ঋণ দিয়েছে মাত্র, অথচ বর্তমান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের মূলধনের ৮ থেকে ২০ গুণ ঋণ পর্যন্ত দিয়ে থাকে এবং এই অনুপাত দিন দিন কেবল বেড়েই চলছে। সোয়া তিন শত বছর আগে ১৬৯৪ সালে ইংল্যান্ডে এই ব্যবস্থা আইনগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। তখন এই অনুপাত ছিল ২ গুন যা ধীরে ধীরে বাড়াতে বাড়াতে এখন পৃথিবীতে কিছু দেশে এখন ৫০ গুণে চলে এসেছে। আর ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার এবং ক্যাশলেস ইকনোমির যুগেতো এই অনুপাতের প্রাসঙ্গিকতা কেবল কমেই আসছে।

চিন্তার খোরাক

- আমরা কি ধীরে ধীরে শতভাগ ব্যাংক লেনদেনের দিকে চলে যাচ্ছি?
- ইলেকট্রিক পেমেন্ট সিস্টেম কি সেই ধারাকেই ত্বরান্বিত করছে?
- প্রস্তর যুগে কি চেকের ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল? কেন বা কেন নয়?

ডেপজিট ব্যাংকিং

আগেকার আমলে সবার বাসায় সিন্দুক থাকত। যার বাসায় সিন্দুক নেই সে তার কলসি কিংবা কুয়াতে মোহর রেখে দিত যাতে ডাকাতের হাতে না পড়ে। এখন, ব্যাংক যদি সম্পদ 'গচ্ছিত' রাখার দায়িত্ব নেয়, তাহলে কি সবার জন্য সুবিধা না? আচ্ছা, ব্যাংক এত ঝুঁকি কেন নিতে গেল?

চলুন, ব্যাংক এর নিজের কাছে অপরের টাকা রাখার 'লাভ' আর 'লোভ' এর কাহিনিটা শুনি।

স্বপন সাহেব একজন নামকরা সওদাগর। সাতসাগর পাড়ি দিয়ে তিনি সোনা-গহনা-হীরা-জহরত জোগাড় করে এনেছেন। তিনি চান না তার বাসাতে ডাকাত এসে হামলা করুক। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে সব সম্পদ তিনি 'তন্দ্রা' ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা করে দিলেন। ব্যাংকের ম্যানেজার নিশি, স্বপন সাহেবের নামে একটা 'অ্যাকাউন্ট' খুলে সেই অ্যাকাউন্টের বিপরীতে সম্পদ জমা লিখে রাখল এবং তাকে একটা সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিল, যেখানে লেখা আছে, 'স্বপন সাহেবের ১ বাক্স মোহর 'তন্দ্রা' ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা করা আছে, তিনি যখন ইচ্ছা তখন তা তুলে নিতে পারবেন।'

এরপর থেকে যখনই প্রয়োজন, স্বপন সাহেব ব্যাংকে গিয়ে একটু একটু করে মোহর তুলে আনেন এবং সুখে শান্তিতে দিন পার করেন। এখন পর্যন্ত ব্যাংক সমাজের পরম বন্ধু, বিনা মূল্যে অন্যের সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করছে।

স্বাভাবিকভাবেই, আপনি আপনার মোহর নিরাপদে কোথাও রাখলে এবং যখন প্রয়োজন তখনই খরচ করতে পারলে এই মোহর নিয়ে প্রতিষ্ঠান কি করছে তাতে আপনার কোনো আপত্তি নেই। এদিকে যেই পারুক বা নাই পারুক, অলস মোহর ব্যাংক সহ্যই করতে পারে না। যে প্রতিষ্ঠান টাকা দিয়ে টাকা বানায়, টাকা পড়ে থাকতে দেখলে সে নিজের হাত কামড়াবে এবং অলস টাকা কাজে লাগাতে চাইবে যেকোনো মূল্যে!

কিছুদিন বাদে নিদ্রা একটা দীঘি খনন করতে ৪ বছরের জন্য ১০% সুদে ২ হাজার মোহর ঋণ চাইলো। ব্যাংকও সুন্দর করে ঋণ দিয়ে দিল। পরিবর্তনটা লক্ষ্য করেছেন? সিন্দুকের মুদ্রার মালিক কিন্তু ব্যাংক না। এটা স্বপন সাহেব সহ আরো যেসব গ্রাহক 'নিরাপদে' রাখতে 'জমা' রেখেছিলেন তাদের সম্পদ। ব্যাংক এখন সেই টাকাই ঋণ দিয়ে তার উপর সুদ নিচ্ছে। এভাবে বছর শেষে ১০% সুদে ২০০ মোহর ব্যাংক নিজের পকেটে ভরে ফেলল! ব্যাংক যদি ১০ হাজার মোহর ঋণ দিত, তাহলে একেবারে বিনা পুঁজিতেই বছরে ১,০০০ মোহরের মালিক হয়ে যেত!

ডেপজিট স্কিম উদ্ভাবন আরেকটি যুগপৎ পরিবর্তন নিয়ে এনেছে ব্যাংকিং খাতে। এবার চলুন এই পরিবর্তনগুলো ভালো করে বুঝতে আমরা আমাদের জ্ঞানের তরী জীবনসাগরের তীরে ভিড়াই।

গত বার ধরে নিয়েছিলাম রূপনগর সব দিকে থেকে রূপসাগরের মতন, পার্থক্য কেবল চেকে। এবারে চেকের কথা ভুলে যান। কারণ আমরা এখন চলে যাচ্ছি নতুন একটি দ্বীপে। এই দ্বীপের নাম জীবনসাগর। এখানে কোন চেক নেই, সবাই হাতে হাতে মোহর লেনদেন করে। সব দিক থেকেই জীবনসাগর দ্বীপটি রূপসাগরের মতন, পার্থক্য একটাই- ডেপজিট স্কিম। রূপসাগর কিংবা রূপনগরে ব্যাংকে কোনো কিছু সঞ্চয় করে রাখা যেত না। সবাই ব্যাংক থেকে কেবল ঋণ নিত। জীবনসাগরে সম্পদ জমা করা এবং ঋণ নেওয়া দুইটাই করা যায়। শুধু এই-ই পার্থক্য।

যাই হোক, আনন্দ নামে এক তরুণ উদ্যোক্তার স্বপ্ন হলো সে সুদের ব্যবসা করবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তার হাতে কোনো পুঁজি নেই। পুঁজি বলতে আছে কেবলমাত্র একটি লোহার সিন্দুক। লোহার সিন্দুক দিয়ে কিভাবে সুদের ব্যবসা করবে এই চিন্তা করতে করতে তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল।

পরদিন সকাল থেকে সে দ্বীপের সবার কাছে গিয়ে গিয়ে বলতে লাগলো, 'শুনুন প্রিয় দ্বীপবাসী, আর কত দিন মেঝে, কলসি কিংবা কুয়াতে মোহর রেখে চিন্তায় চিন্তায় দিন পার করবেন? এই যে দেখুন, আমার কাছে কত সুন্দর এবং নিরাপদ একটি লোহার সিন্দুক আছে। আপনাদের যে কারও বাসায় টাকা রাখার চেয়ে এখানে টাকা রাখা আরও নিরাপদ। আজ থেকে আপনারা সবাই নিজ নিজ মুদ্রা আমার সিন্দুকে জমা রাখতে পারেন। এর বিনিময়ে আমাকে কিছুই দিতে হবে না। আমি বিনা মূল্যে এই সেবা প্রদান করছি এবং ক্ষয়ক্ষতির দায়ভারও নিচ্ছি।'

দ্বীপ-নিবাসীদের কাছে এই প্রস্তাব ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই। তাই সবাই এর পর থেকে নিজ ঘরে রাখার মত অনিরাপদ কাজ না করে বরং লোহার সিন্দুকেই মুদ্রা রাখবে এবং যার যখন প্রয়োজন তখন একটু একটু করে তুলে ব্যয় করবে।

এভাবে জীবনসাগর দ্বীপে চমকপ্রদ একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন হলো, যেখানে অধিবাসীরা তাদের সম্পদ নিরাপদে রাখতে পারে। আনন্দ যেহেতু এই কাজটি খুব নিপুণভাবে সততার সাথে করছে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে ঘরের আলমারির ড্রয়ারের মত দ্বীপের অধিবাসীরাও সিন্দুকে মুদ্রা জমা রাখবে এবং প্রয়োজন বোধে সেখান থেকে তুলে নিবে। আলমারিতে টাকা রাখার এবং খরচ করার মাঝে যেমন কিছু মুদ্রা অলস পড়ে থাকে, ঠিক তেমনি করে সিন্দুকে কিছু মোহর অলস পড়ে থাকবে। এই অলস পড়ে থাকা মোহরই হচ্ছে আনন্দের মূলধন।

ধরা যাক, আনন্দের সিন্দুকে গড়পরতা ১,০০০টি মুদ্রা অলস পড়ে থাকে। ১০০টি মুদ্রা জরুরি জমা রেখে আনন্দ বাকি ৯০০টি মুদ্রা ঋণ দিয়ে বছর বছর সুদ পেতে থাকবে (আপাতত হাওয়াই মুদ্রার ব্যাপারটা আমলে নিলাম না)। এভাবে আনন্দের আয় রোজকারের খুব সুন্দর একটি ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মুদ্রা সবসময় একজনের হাত থেকে অপর কারো হাতে প্রবেশ করে, তাই কারো ব্যয় হওয়া মানে কারো আয় হওয়া। যে ব্যক্তি আনন্দের থেকে ৯০০টি মুদ্রা ঋণ নিয়েছেন, তিনি যেভাবেই ঋণের টাকা খরচ করেন না কেন, এই মুদ্রা জীবনসাগরের মাঝেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। এখন যেই ব্যক্তি নতুন আয় করলেন তার বাসায় এই আয়কৃত মুদ্রা রাখার চেয়ে যেহেতু সিন্দুকে রাখা নিরাপদ, তিনিও এই মোহর নিরাপত্তা বোধে আনন্দের কাছে জমা রাখবেন। অর্থাৎ, ঘুরে ফিরে সব মুদ্রা আনন্দের কাছেই ফিরে আসবে।

৯০০টি মুদ্রা পুনরায় জমা হবার পরে সিন্দুকে মোট মুদ্রা আবারো ১০০০টি হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, সিন্দুক থেকে বের হওয়া মুদ্রা ঘুরে ফিরে আবার আগের জায়গাতেই ফিরে আসলো এবং মাঝখান দিয়ে সুদ অর্জিত হলো।

লক্ষ্য করুন, মুদ্রা সিন্দুকে ফের জমা হওয়া মানে ঋণ পরিশোধ হয়ে যাওয়া নয়। যেই ব্যক্তি ঋণ নিয়েছেন সে ব্যক্তি এখনও ঋণীই আছেন। সোনার মোহর কেবল হাত বদল করেছে এবং নতুন কিছু সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের নামে সিন্দুকে মুদ্রা জমা পড়ছে। তাই একই সাথে সিন্দুক থাকছে ভরা এবং সুদ আসছে চড়া।[১৭]

বিক্রি করার মত পণ্য হাতে ফেরত আসলে সবাই যা করে আনন্দও তাই করবে। আবারো ঋণ দিয়ে দিবে। তবে এবার ৯০০টি মুদ্রা ঋণ দিবে না। কারণ আগে মোট ডেপোজিট ছিল ১,০০০টি মুদ্রার কিন্তু এখন মোট ডেপোজিট ১,৯০০টি মুদ্রার! সবাই যদি একসাথে মুদ্রা তুলতে আসে, আনন্দের লেজে-গোবরে অবস্থা হবে। তবে আশার বাণী এই যে জীবনসাগরের সবাই একসাথে মুদ্রা তুলতে আসবে না, কারণ সবাই আনন্দের সিন্দুকে নিজেদের সম্পদ নিরাপদ মনে করে।

এদিকে সিন্দুকের অলস মুদ্রা পুনরায় ঋণ দেবার জন্য আনন্দ বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করবে। যেহেতু প্রথমবার ১০০০টি মোহর ডেপোজিটের বিপরীতে ১০০টি মুদ্রা জরুরি সঞ্চয় করা হয়েছিল, এখন ১৯০০টি মুদ্রা ডেপোজিটের বিপরীতে জরুরি ভিত্তিতে ১৯০টি মুদ্রা রাখা উচিত। সুতরাং, আনন্দ ১৯০টি মুদ্রা সঞ্চয় করে মোট ৮১০টি মুদ্রা ঋণ দিবে। এবার সুদ আসতে থাকবে ৯০০ + ৮১০ = ১৭১০টি মুদ্রার উপর। এদিকে নতুন ঋণগ্রহীতারা ঋণের মুদ্রা আবার খরচ করে ফেললে অপর কারো আয় বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রা তাদের হাতে জমা হবে এবং ঘুরে ফিরে দ্বিতীয় বার সিন্দুক থেকে বের হওয়া মোহর সিন্দুকেই জমা হবে। আনন্দ এবারে মুদ্রা দিয়ে নিশ্চয়ই বসে বসে ধ্যান করবে না। সে আবারো ঋণ দিয়ে দিবে। তবে এবারে সে ৮১টি মুদ্রা জমা রেখে ৭২৯টি মুদ্রা ঋণ দিবে।

১৭ দ্বীপের সবার ঋণ এবং আয় উভয়ই বেড়ে গেছে। এক কথায় এইটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের 'উন্নয়ন' এর চিত্র। আশা করি, এই উদাহরণ পড়ে উন্নয়নের শুভঙ্করের ফাঁকি কি আপনারা বুঝতে পারছেন।

এভাবে চলতে চলতে শেষ অব্দি মোট ৯০০ + ৮১০ + ৭২৯... বা ১০,০০০টি মুদ্রা ঋণ দেওয়া হয়ে যাবে। এই যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে মাত্র ১০০০টি মুদ্রা ১০ গুন করে ফেলা হলো, অর্থনীতির ভাষায় এর নাম মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট।[১৮] মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট হিসাব করতে আমরা অসীম ধারার সমীকরণ ব্যবহার করে থাকি।

আনন্দ যেহেতু প্রতি চক্রে ১০% মোহর রিজার্ভ করে রাখে, এই নীতির কারণে ১,০০০টি মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১০,০০০টি মুদ্রায় রূপ লাভ করবে। এই ১০% রিজার্ভ রাখার হারকে বলে রিজার্ভ রেশিও বা আধুনিক ব্যাংকিং টার্মে Cash Reserve Requirement Ratio আর বাংলাদেশ ব্যাংকের এপ্রিল ২০২১ সালের Cash Reserve Requirement Ratio ছিল মাত্র ৪%!

উদাহরণে উল্লেখ করা মাত্র ১০% Cash Reserve Requirement Ratio চক্রে পড়ে মাত্র ১০০০ মোহর পুঁজি ১০,০০০ মোহরে রূপ নেয়। আর ৪% রিজার্ভ রেশিওতে তা রূপ নিত ২৫,০০০ মোহরে। যাই হোক, আনন্দ মাত্র ১০ শতাংশ সুদ নিলে বছরে তার আয় হচ্ছে ৯০০টি স্বর্ণ মুদ্রা এবং ২০ শতাংশ সুদ নিলে আয় হচ্ছে ১,৮০০টি স্বর্ণ মুদ্রার। কিন্তু আনন্দের মূলধনই ছিল শূন্য। কেবলমাত্র সিন্দুককে পুঁজি করে, অন্যের টাকা ব্যবহার করে সে এত লাভ করতে পারলো।

ব্যাংক চালু করার পরে প্রতি বছর যে নতুন সুদ আসবে তা হবে তার নিজস্ব পুঁজি। এই অর্জিত পুঁজি দিয়ে সে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভের সাধনা করবে না। বরং সুদের চক্র চালিয়ে নতুন পুঁজির বিপরীতে আরও দশ গুন ঋণ তৈরি করবে এবং সুদ নিবে। এভাবে ছুটতে থাকবে নতুন মুদ্রা তৈরি করে ঋণ দেবার ঘোড়া দৌড় আর তার সাথে বাড়তে থাকবে আয়, ঋণ ও সুদ।

> 'In the past people used to rob banks, now the banks rob the people.'
> - David Alejandro Fearnhead
> Freelance Journalist

১৮ অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন ব্যাংক থেকে বের হওয়া সম্পূর্ণ টাকা ব্যাংক ব্যবস্থায় ফেরত আসে না, কিছু টাকা মানুষ আলমারিতে বা পকেটে রেখে দেয়। যেমন সাধারণত ধরা হয় যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বের হওয়া শতকরা ৯০ ভাগ টাকাই আবার ফেরত আসে, নাকি ১০ শতাংশ হাতে হাতে ঘুরে, বা আলমারিতে সঞ্চিত থাকে ইত্যাদি। তবে বর্তমানে ডেবিট কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারের ফলে প্রায় ক্যাশ লেস ইকনমি হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রায় পুরো টাকাই ফেরত আসবে কল্পনা করাটা অবাস্তব নয়।

'একসময় চোরেরা ব্যাংক লুট করত, আর বর্তমানে ব্যাংক নিজেই লুট করে মানুষের টাকা।'

–ডেভিড আলেহান্দ্রো ফার্নহেড

আচ্ছা, আনন্দ যে 'জমাকারীদের' পয়সায় এত আনন্দ করছে, সেটা জানাজানি হলে কি হবে? জমাকারীরা বলে বসবে, ভাই আপনিও খাচ্ছেন, আমাদের দিবেন না? আনন্দ যখন গ্রাহককে অর্জিত সুদের ভাগ দিবে, তখন যারা 'সুদ-এর লাভ' এর আশায় ব্যাংকে মুদ্রা জমা রাখছে, প্রত্যেকেই পরিণত হচ্ছেন এক একজন মহাজনে। আমাদের চারপাশ আজকাল এমন মহাজনে ভরপুর।

চিন্তার খোরাক

- বিশেষ কোনো প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া কি ডেপোজিট ব্যাংকিং চালু করা সম্ভব? কেন বা কেন নয়?
- সবার সম্পত্তি বিনামূল্যে নিরাপদে জমা রেখে ব্যাংক কি সবার উপকার করছে নাকি ক্ষতি করছে? কিভাবে?

মুক্তবাজার অর্থনীতি

হাওয়াই টাকা, চেক এবং ডেপোজিট স্কিম একসাথে চালু করতে পারলে আমরা আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার একেবারে দ্বার প্রান্তে পৌছে যাব। তবে এখনও আরো কিছু পথ পাড়ি দেওয়া বাকি আছে। বর্তমান বিশ্বের সাথে উপরের সবগুলো কাঠামোর একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের আলোচনায় কেবল একজন মহাজন কিংবা একটি ব্যাংক উপস্থিত আছে বলে ধরে নিয়েছি। তাই মুক্ত বাজার এবং ব্যাংকিং প্রতিযোগিতা ছিল না। বর্তমান বিশ্বের চিত্র সেই তুলনায় ভিন্ন।

প্রথমত, বর্তমানে যেকোনো রাষ্ট্রে অনেকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকে এবং এই ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। কোনো ব্যাংকে সুদের হার কম এবং গ্রাহক সেবা উন্নত হলে একজন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের থেকে ঋণ নিতে কেউ দায় বদ্ধ থাকে না। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজেদের মধ্যে গ্রাহক আকৃষ্ট করতে প্রতিযোগিতা করতে থাকে এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার কারণে ব্যাংক ঋণের উপর সুদের হার কমে আসে।

দ্বিতীয়ত, একটি অর্থনীতিতে ঋণ নেওয়ার মত উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। গ্রহণযোগ্যতা যাচাই বাছাই না করে কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যায় না। এক পর্যায়ে ঋণ নেবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়াটাই ব্যাংকের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব না।

সবশেষে, উপযুক্ত গ্রাহক খুঁজে পেতে, গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি করতে, মার্কেটিং করতে, ঋণ নেবার সক্ষমতা নিয়মিত যাচাই করতে এবং সুষ্ঠুভাবে ক্যাশ পরিচালনা করতে ব্যাংককে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই সবকিছুর ফলে ব্যাংকের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং লাভ কমে যায়।

সব মিলিয়ে বর্তমান বিশ্বে ব্যাংকিং খাত অনেক প্রতিযোগিতাপূর্ণ। উপরের গল্পের মত প্রাচীন কালে নেই। তাই সুদও আগের মত মহাজনী পর্যায়ে নেই।

প্রতিযোগিতা এবং মুক্তবাজার পূর্বোক্ত সমীকরণের ফলাফল বদলে দিয়েছে নাকি কেবল জটিলতা যুক্ত করেছে, তা আমাদের জন্য বোঝা জরুরি।

এবার আমরা আমাদের কাঠামোতে আরও দুটি সরলীকরণের বাধ তুলে নিচ্ছি। এখন থেকে যুক্ত হতে যাচ্ছে মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং বাজার অর্থনীতি।

আমরা এর নাম দিলাম সুবর্ণ-নগর। সুবর্ণ-নগর একটি দেশ যার অর্থনীতি গুণে মানে এবং মুদ্রা ব্যবস্থায় রূপসাগরের মতই। তবে পার্থক্য হচ্ছে এখানে সুদের ব্যবসা একচেটিয়া নয়। রূপসাগরের রিবার মতই যখন সুবর্ণ নগরের রিশি (জাপানি ভাষা রিশি'র অর্থ হচ্ছে সুদ) ৫০টি মুদ্রা পুঁজিতে সুদের ব্যবসা শুরু করবে, তখন রিশির প্রতিবেশী বিয়াজও (হিন্দি ভাষায় বিয়াজ'র অর্থ হচ্ছে সুদ) ৫০টি মুদ্রা পুঁজি নিয়ে সুদের ব্যবসা শুরু করে দিল। লক্ষ্য করুন, সুবর্ণ-নগরে সুদ ব্যবসায়ী দুই জন, বিয়াজ এবং রিশি। উভয়ে মিলে একদিন দেশের সবকটি মুদ্রার মালিক হবে। কিন্তু কে কতটুকু মুদ্রার মালিক হবে তা অনিশ্চিত। তাই যার যতটুকু সম্ভব, ততটুকু মুদ্রা হস্তগত করতে মরিয়া হয়ে লড়াই করতে থাকবে।

এই প্রতিযোগিতার দৌড়ে জেতার মূল উপাদান তিনটি।

এক. ঋণের পরিমাণ যথা সম্ভব বৃদ্ধি করা,

দুই. যথা সম্ভব কম গ্রাহক দেউলিয়া না হওয়া এবং

তিন. গ্রাহক দেউলিয়া হলে সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা।

যেহেতু দু'জনেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে তারা মরিয়া হয়ে যাবে এবং টাকা আদায়ের বেলায়ও তাদের মুষ্ঠি কঠোর থেকে

কঠোরতর হবে। এমনটি না করতে পারলে প্রতিযোগিতার বাজারে পিছিয়ে পড়া সুনিশ্চিত।

গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে মোট ঋণের বৃদ্ধি করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সুদের হার কমানো। বিয়াজ আর রিশি, দুই জনই প্রতিবেশী হওয়ায় যার ঋণে সুদের হার কম, তার দরজাতেই সবাই ঋণ নিতে ভিড় জমাতে থাকবে। এভাবে তাদের সুদের হার কমতে থাকবে। কিন্তু সব মিলিয়ে সমীকরণের ফলাফল বদলাবে কি? সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, তার আগে দেখে নেই বহু সংখ্যক সুদ কারবারি একত্রে প্রতিযোগিতা করতে থাকলে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সুদের রূপ কেমন হবে।

ধরি, বিয়াজ ও রিশির পাশাপাশি আরও নতুন নতুন ব্যক্তি যেমন লিরুন, এরডেকলোডেস এবং এন্দিয়াফেরন সবাই এই পেশায় যোগ দিল।[১৯] তারাও প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য সুদের হার কমাবে। এভাবে সুদের দর কমতে কমতে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে ঠেকবে, যা হচ্ছে সুবর্ণনগরে সুদের বাজার দর (মার্কেট রেট)।[২০] এভাবে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রথমে যখন রিশি একা ছিল, সুদের বাজার ছিল একচেটিয়া। একচেটিয়া বাজারে গ্রাহক সেবা হয় সর্বনিম্ন এবং পণ্যের মূল্য (বা সুদের হার) হয় সর্বোচ্চ।

পরবর্তীকালে যখন বিয়াজ এসে একই ব্যবসায় লিপ্ত হলো, বাজার পরিণত হলো দ্বৈত্বচেটিয়ায়। দৈত্বচেটিয়ার বাজারে পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম এবং গ্রাহক সেবা উন্নততর।

সবশেষে, এই যখন সবাই প্রবেশ করলো, তখন হয়ে গেল মুক্তবাজার অর্থনীতি। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্যের দাম, অর্থাৎ সুদের হার সর্বনিম্ন এবং গ্রাহক সেবা সর্বোচ্চ।

---

১৯ (লিরুন = চীনা ভাষায় সুদ, এরডেকলোডেস = হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় সুদ এবং এন্দিয়াফেরন = গ্রিক ভাষায় সুদ)

২০ একটি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সুদের হার কত হবে তা নির্ভর করে প্রথমত, ঋণের বাজার ব্যবস্থার উপর। অর্থাৎ, বাজারে কি পরিমাণ তারাল্য আছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি ভূমিকা পালন করছে ইত্যাদির উপর।

দ্বিতীয় যেই বিষয়টির উপর সুদের হার নির্ভর করে তা হল একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহণযোগ্যতা। সেজন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভেদে সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর্থিক অবস্থা খুব গুছানো, সুন্দর, পরিপাটি থাকলে সুদের হার এক রকম, আবার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয় হলে সুদের হার আরেক রকম। একারণে আমরা বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই, রাষ্ট্র ভেদে সুদের হার ভিন্ন, আবার একই অঞ্চলে এক এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদের হার এক এক রকম।

এই যে এত কিছু হল, সব মিলিয়ে সমীকরণের ফলাফল বদলালো কি?

লক্ষ্য করুন, মুক্তবাজার সুদে প্রত্যেকটি সুদী মহাজনই কিছু না কিছু পুঁজি নিয়ে মাঠে নেমেছিল। তাদের পুঁজি যোগ করলে দেখা যাবে সব মিলিয়ে সমাজের প্রচুর পরিমাণ অর্থ ঋণে পরিণত হতে চাইছে। তাই তারা বিজ্ঞাপন দিয়ে, সুদের হার কমিয়ে বা সেলস এজেন্ট নিয়োগ করে অধিক সংখ্যক গ্রাহককে ঋণের আওতাভুক্ত করে ফেলবে। এভাবে সুদের হার কমলেও মোট ঋণ এবং ঋণী ব্যক্তির পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। আর যেহেতু মুক্তবাজারে মোট ঋণের পরিমাণ হয় অনেক বেশি, খুব দ্রুতই সব মুদ্রা সুদী মহাজনদের (বা ব্যাংকারদের) মালিকানায় চলে আসবে। অর্থাৎ, দিন শেষে সব মুদ্রা মহাজনদের (বা ব্যাংকারদের) হাতেই কুক্ষিগত হবে এবং মুক্ত সুদের বাজার সমাজকে অর্থনৈতিক শোষণ এবং বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

সব মিলিয়ে ব্যাংকিং প্রতিযোগিতা সুদের কুফল থেকে কোন অংশে সমাজকে মুক্ত করতে পারে না। এই প্রতিযোগিতা কেবল একটিই উপকার করতে পারে। সুদের হার কম রাখা। অর্থনীতিতে সুদের হার কমে গেলেও যদি সুদী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলেও মুদ্রা কেন্দ্রীভূত হতে সময় বেশি লাগে না। কারণ সমাজের অধিক পরিমাণ অর্থ সুদের সাথে জড়িত হয়ে যায়। আর যদিও ব্যাংকের মাঝের উগ্র প্রতিযোগিতা থাকলে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি পায়, একে সরল ভাবে দেখার কিছু নেই। 'ব্যাংক যত নম্র ভদ্রই হোক না কেন, দিন শেষে সে কৌশলে আপনার সম্পত্তি নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করে ফেলে।'

বই এর একেবারে শুরুতে আমরা হিসেব করে দেখিয়েছিলাম যে সুদের হার কম হলেও, সব মুদ্রা এক কব্জাতেই আসছে। এখন আমরা দেখলাম এক কারবারির জায়গায় একাধিক কারবারি আসলেও সমীকরণের কিছুই বদলাবে না, দিন শেষে সুদী কারবারিদের হাতে সব মুদ্রা পুঞ্জিভূত হবে। তারপর কি হবে?

একটি এলাকা দশ জন ভূমিদস্যু দখল করে নেয়ার পরে যেমন তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, কে কত বড় এলাকা নিজের দখল করে নিবে সেইটা নিয়ে, ঠিক তেমনি সুদের কারবারিরাও সব মুদ্রা দখল করার পরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে থাকবে কত বেশি মুদ্রা+সম্পদ নিজের হস্তগত রাখতে পারবে তা নিয়ে। তবে এই যুদ্ধ ঢাল তলোয়ারের না, ঋণের। ঋণ দিতে পারলে ক্ষমতার সীমানা বড় হয় আবার গ্রাহকরা বিনা জামানতে ঋণ খেলাপি করলে সীমানা ছোট হয়। এই দুই সমীকরণের মার-প্যাঁচে নির্ধারিত হয় কার রাজত্ব কত বিশাল।

অষ্টম অধ্যায়

এই পর্যন্ত আমরা কেবল লেযে ফেয়ার বা স্বাধীন অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। একদম আদিম ও অকৃত্রিম অর্থনীতি যাকে বলে। সেখানে ছিল না কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ছিল কোন সরকারি নীতিমালা, না ছিল কোনো শক্তিশালী দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। সেই হিসেবে আমরা অনেকটা ভিন্ন পৃথিবীতে আছি। এই পৃথিবীতে উপরের সূত্রগুলো খাটবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস এবং তথ্য উপাত্তের নিরিখে দেওয়া প্রয়োজন।

টাকার গোপন রহস্য

একসময় টাকা বলতে বোঝাতো সোনা, রূপা, তামা, নিকেল, কড়ি, পাখির পালক, কাঠের দণ্ড ইত্যাদি। পৃথিবীর এক এক স্থানে এক এক কালে এক এক রকম টাকা চালু ছিল। তাই টাকা কি, তার বিশ্বব্যাপী কোনো সাধারণ রূপ ছিল না। মুদ্রার গুণাবলি পূরণ করতে পারে এমন যেকোনো বস্তুই ছিল টাকা। তবে টাকা হিসেবে প্রাচীন চীনে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিল তামা। মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে পছন্দের শীর্ষে চলে আসে সোনা। এদিকে সোনার মুদ্রা জনপ্রিয় হয়ে উঠায় ইউরোপে নতুন একটি সমস্যা দেখা দিল। সোনার সরবারাহ খুব সীমিত। অর্থনীতি বড় হলে, বাড়তি লেনদেনের জন্য দরকার পড়ে বাড়তি সোনার। ওই সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারলে শুরু হয় মূল্যহ্রাস (বা সোনার দাম বৃদ্ধি)। তাই নতুন খনি আবিষ্কার করে সোনা উৎপাদনের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এই সোনার খোঁজেই কলম্বাসসহ বহু অভিযাত্রী সমুদ্র পথে পাড়ি জমান।

তবে সোনা অনেক মূল্যবান এবং ভারী দেখে ঘরে সোনা সংগ্রহ করে রাখা অনিরাপদ এবং বড়সড় কেনাকাটা করতে বহন করাটাও বেশ সমস্যাজনক। তবে তার সহজ সমাধান মানুষ আবিষ্কার করে ফেলে। শহরের একজন স্বর্ণকারের সিন্দুকে যে যে যার যার স্বর্ণ জমা রাখবে এবং প্রয়োজন

অনুযায়ী তুলবে। যেই গ্রাহক স্বর্ণ জমা রাখবে তার জমাকৃত সোনার বিপরীতে স্বর্ণকার একটি কাগজের রিসিট লিখে দিবেন, 'সিন্দুকে অমুক ব্যক্তির এত পরিমাণ স্বর্ণ জমা আছে।' পরবর্তীকালে এ ব্যক্তি রিসিট দেখিয়ে সোনা তুলে আনতে পারবে। এই সেবার বিনিময়ে স্বর্ণকারকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে যেহেতু তিনি সোনার কঠোর নিরাপত্তা প্রদান করছেন।[২১]

বর্তমান সময়ের ব্যাংকের মতই সেই সময় ইউরোপে স্বর্ণের মালিকরা স্বর্ণকারের সিন্দুকে সোনা জমা রাখতেন এবং একটু একটু খরচ করতেন। এতে দুটি উপকার পাওয়া যেত। ঘরে চোর ডাকাতের আক্রমণ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হতো না এবং গ্রাম থেকে শহরে কেনাকাটা করতে যাবার সময় বিপদ সংকুল পথে বার বার সোনা বহন করতে হতো না। এক পর্যায়ে মানুষ চিন্তা করতে লাগলো, এত কষ্ট করে বার বার সোনা তুলে হাত বদল না করে কেন আমরা রিসিটটাই বদল করছি না?

উদাহরণস্বরূপ, মেরি যখন নিকোলাসের থেকে একটি জমি কিনবে, তখন মেরি কষ্ট করে সিন্দুক থেকে সোনা তুলে এনে নিকোলাসের হাতে মোহর দেবার মত ঝামেলা না করে বরং রিসিটটিই নিকলাসের হাতে তুলে দিয়ে বলবে নিজ দায়িত্বে শহরে গিয়ে এই ঠিকানা থেকে সোনা তুলে নিও। এই কথা শুনে নিকোলাসও মনে মনে খুশি হয়ে যাবে। কারণ, দিনশেষে তাকেও কোনো না কোনো নিরাপত্তা প্রদানকারীর সিন্দুকেই স্বর্ণ জমা রাখতে হতো। এখন তাকে আর বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হবে না। তাই মেরির কাগজের বিনিময়ে নিকোলাস মেরির নামে জমি লিখে দিতে রাজি হয়ে গেল।

এখন নিকোলাস চাইলে যে কোন মুহূর্তে স্বর্ণকারের রিসিট দেখিয়ে নিজ মর্জি মত সোনার মুদ্রা তুলে আনতে পারবে। আবার চাইলে সে মেরির মত দলিলের বিনিময়ে নতুন একটা জমি কিনতে পারে। এভাবেই সমাজে প্রাথমিক পর্যায়ে কাগজের বিনিময়ে লেনদেন প্রথা শুরু হল। পরবর্তীকালে যার নাম দেওয়া হলো টাকা। এক বাক্যে স্বর্ণকারের সিন্দুকে জমা রাখা স্বর্ণের রিসিটই (নোট) হচ্ছে টাকা।[২২]

(বি. দ্র.- আমাদের অনেকের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে টাকার মালিক সরকার। সরকার নিজ প্রয়োজনে টাকা ছাপিয়ে রাষ্ট্রের ব্যয়ভার বহন করতে পারে। এই ধারণাগুলো সত্য নয়। উপরের বর্ণনায় লক্ষ্য করুন,

---

২১ এটি একটি ব্যবসা মডেল এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সুদ মুক্ত।

২২ এখন পর্যন্ত পুরা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সুদ মুক্ত এবং ন্যায্য।

কাগুজে নোট বা টাকা কিন্তু সরকার উৎপাদন করেনি। জনগণ এবং সোনার পাহারাদারের সমন্বিত উদ্যোগে সোনার মজুদের বিপরীতে টাকা তৈরি হয়েছে। সোনা তৈরি করার ক্ষমতা যেহেতু কারও নেই, প্রাথমিকভাবে টাকা সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি মুদ্রাব্যবস্থা হিসেবেই গড়ে উঠেছিল এবং এর উপর ব্যাংক বা সরকার কারো কোনো হাত ছিল না। টাকা ছিল কেবলমাত্র একটি জমাকৃত সোনার রিসিট। পরে অবশ্য এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসা শুরু করে যা আমরা অচিরেই আলোচনা করব।)

সর্বপ্রথম চীনে ব্যাপক ভাবে টাকার প্রচলন শুরু হয়। ১৩ শতাব্দীতে মার্কো পোলো চীন ভ্রমণ শেষে ইউরোপে ফেরত এসে তার নিখুঁত বর্ণনা করে গেছেন যা তৎকালীন ইয়োরোপীয় শ্রোতাদের নিকট গল্পের মতই মনে হয়েছিল।

> *'All these pieces of paper are, issued with as much solemnity and authority as if they were of pure gold or silver... with these pieces of paper, made as I have described, Kublai Khan causes all payments on his own account to be made; and he makes them to pass current universally over all his kingdoms and provinces and territories, and whithersoever his power and sovereignty extends... and indeed everybodz takes them readily, for wheresoever a person may go throughout the Great Kaan's dominions he shall find these pieces of paper current, and shall be able to transact all sales and purchases of goods by means of them just as well as if they were coins of pure gold'*
>
> *— Marco Polo, The Travels of Marco Polo*

> *'কাগজের টুকরোগুলি এতটাই গাম্ভীর্য এবং কর্তৃত্বের সাথে জারি করা হয় যেন সেগুলো খাঁটি সোনা বা রৌপ্যের তৈরি... যেমনটা বলছিলাম, সেই কাগজের টুকরোগুলো দিয়ে কুবলাই খান নিজের সকল খরচ বহন করেন; এবং তার ক্ষমতা যেসকল রাজ্য, প্রদেশ ও অঞ্চলে বিস্তৃত সবখানেই তিনি নোটগুলো জারি করেন... সবাই মুদ্রা হিসেবে নোটগুলোকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। আপনি গ্রেট খানের রাজত্ব জুড়ে যেখানেই যান না কেন সবখানেই এই কাগজের নোটগুলো খুঁজে পাবেন, এবং সেগুলোর মাধ্যমে সব ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন এমনভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন, যেন তা খাঁটি সোনার মুদ্রা।'*
>
> *-মার্কো পোলো, দ্যা গ্রেট ট্রাভেলস অব মার্কো পোলো*

আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার আবিষ্কার

মানুষ যখন স্বর্ণকারের সিন্দুকে সোনা জমা রাখা শুরু করলো তখন কিছু অলস সোনা সবসময় সিন্দুকে জমা পড়ে থাকতো। এই অলস পড়ে থাকা সোনার মুদ্রা কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই নিয়ে স্বর্ণকারেরা চিন্তা ভাবনা করে একটি বুদ্ধি বের করল। তারা এই সোনা ঋণ হিসেবে তৃতীয় পক্ষকে ধার দিয়ে দিলো। এদিকে সবাই যেহেতু একসাথে সোনা তুলতে আসতো না, গ্রাহকদেরও কোনো সমস্যায় পড়তে হত না। সোনার জায়গায় সোনা এবং ঋণের জায়গায় ঋণ হাতে হাত ধরে চলত। এভাবে সোনার মালিক না হয়েও স্বর্ণকাররা ঋণের উপর সুদ ভোগ করতে থাকলো এবং ইউরোপে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাংকিং শুরু হলো।

এদিকে কাগুজে মুদ্রার ব্যবহার চালু হলে ব্যাংকারদের অবস্থা একেবারে লালে লাল। কারণ নোট দিয়েই যদি কাজ হয়ে যায় সোনা তোলার প্রয়োজন কি? এভাবে সিন্দুকে আরও বেশি পরিমাণ অলস সোনা জমতে থাকলো এবং ব্যাংকাররা তা ঋণ দিয়ে আরও বেশি পরিমাণ সুদ অর্জন করতে লাগলো।

লক্ষ্য করুন, ব্যাংকিং সিস্টেম আসার ফলে কাগুজে মুদ্রা আর বিশুদ্ধ সোনার রিসিট থাকলো না। ব্যাংক নোটের বিপরীতে যেই সোনা সিন্দুকে গচ্ছিত থাকার কথা ছিল তা ঋণ দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। আরও বড় একটি সমস্যা হচ্ছে, ঋণ দেবার পরে যদি ঋণ বিফলে যায়, অর্থাৎ, কেউ দেউলিয়া হয়ে যায়, তখন সিন্দুকের মূলধন থেকেই বিফল হওয়া অংশটি কাটা পড়ে। কোনো কারণে অতিরিক্ত সংখ্যক গ্রাহক দেউলিয়া হয়ে গেলে (সুদের তুলনায় বিফল ঋণ বেশি হলে) সিন্দুকের সোনার পরিমাণ কমে যাবে। স্বভাবতই ব্যাংকাররা এমন তথ্য গোপন রাখার চেষ্টা করবে। কিন্তু মুখে মুখে একবার ছড়িয়ে গেলে সবাই নোট ভাঙ্গিয়ে সোনা তুলতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে এবং সাথে সাথেই ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যাবে। এমন ঘটনা ইতিহাসে অনেক বার ঘটেছে। ইংরেজিতে যাকে বলে Bank Run।

কাগুজে নোট যখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, তখন ব্যাংকারদের মাথায় নতুন আরেকটি বুদ্ধি আসলো। সিন্দুকের সোনা ঋণ না দিয়ে নতুন নোট লিখে ঋণ আকারে বাজারে ছাড়া শুরু করবে। ব্যাপারটা এমন। ১০জন গ্রাহক মোট ১,০০০টি মুদ্রা জমা করলো। আমি ব্যাংকার হলে আগে ১০টি নোট লিখে দিতাম। তারপরে কুঠুরির ৮০০টি মুদ্রা ঋণ দিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন নতুন একটি ফন্দি বের করেছি। যেহেতু সবার হাতে হাতে টাকা

বিনিময়ের চল শুরু হয়ে গেছে, ৮০০টি মুদ্রা সিন্দুক থেকে বের না করে বরং এর বিপরীতে নুতন নোট লিখে ঋণ দিয়ে দিলাম। এতে আর সিন্দুকের ডালা খুলতে লাগলো না এবং সব মুদ্রা ভেতরেই জমা থাকলো। এদিকে যাকে ঋণ দিলাম তাকেও বলে দিলেম যে তুমি চাইলে এই নোট ভাঙ্গিয়ে আমার থেকে ৮০০টি মুদ্রা যখন প্রয়োজন তখন তুলে নিতে পারো। কিন্তু যেহেতু অনেকেই নোট ব্যবহারে অভ্যস্ত যাকে ঋণ দিলাম সেও সোনা তোলার ঝামেলা করবে না। ফলে সিন্দুকের সোনা জায়গাতেই পড়ে রইল এবং আমি ৮০০টি মুদ্রার উপরে সুদ পেতে থাকলাম। অত্যন্ত নিরাপদ আয়।

খেয়াল করে দেখুন, সিন্দুকে জমা আছে ১০০০ মুদ্রা কিন্তু ১৮০০ মুদ্রার নোট ইস্যু করা হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ব্যাংকাররা টাকা বানানো শুরু করল।[২৩]

পরবর্তীকালে ব্যাংকাররা আরও দুঃসাহসী এবং অত্যন্ত লাভজনক একটি কৌশল প্রয়োগ করা শুরু করতে থাকে। তারা জমাকৃত সোনার চেয়ে অধিক পরিমাণে ঋণ দেওয়া শুরু করল। উপরে লক্ষ্য করুন, সিন্দুকে জমা আছে ১০০০ সোনার মুদ্রা, কিন্তু এর বিপরীতে নোট ইস্যু করা হয়েছে ১৮০০ মুদ্রার (গ্রাহকের ১০০০ এবং ব্যাংকারের ৮০০)। কিন্তু খুব কম মানুষই টাকা ভাঙ্গিয়ে সোনাতে রূপান্তর করছে দেখে ব্যাংকাররা ভাবল সিন্দুকে তো অলস মুদ্রা পড়ে আছে। আরও কিছু নোট ইস্যু করলে ক্ষতি কি?

ক্ষতি তো নেইই বরং লাভ হবে সবদিক থেকে। তাই তারা আরও কিছু নোট লিখে ঋণ ইস্যু করতে লাগলো। এভাবে দেখা গেলো যেখানে মুদ্রাই আছে ১০০০ মোহর সেখানে ৫,০০০ মোহরের নোট ইস্যু করা হয়ে গেছে। এভাবেই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং (Fractional Reserve Banking) যাত্রা শুরু করে। ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের কল্যাণে ব্যাংকাররা অত্যন্ত ধনী হয়ে ওঠে। অপর দিকে অতিরিক্ত টাকা অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে শুরু করায় ইনফ্লেশন জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে যায়। এই পর্যায়ে এসে গ্রাহকরা দাবি করতে থাকে, 'তুমি একাই সব লাভ নিবে তা হয় না, আমাদের ডেপোজিট ব্যবহার করে তুমি যেই লাভ নিচ্ছ তার থেকে আমাদেরকেও একটি অংশ দাও।' এভাবে ডেপোজিটের বিনিময়ে সুদ অর্জন করার ধারা শুরু হলো।

'This is a staggering thought. We are completely dependent on the commercial banks. Someone has to borrow every dollar we have in circulation, cash or credit. If the banks create ample synthetic money we are prosperous; if not, we starve. We are absolutely

২৩ এর আগে সিন্দুকের জমাকৃত সোনা ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে তারা স্বর্ণ বানিয়েছিল।

without a permanent money system. When one gets a complete grasp of the picture, the tragic absurdity of our hopeless position is almost incredible, but there it is. It is the most important subject intelligent persons can investigate and reflect upon. It is so important that our present civilization may collapse unless it becomes widely understood and the defects remedied very soon.'

- Robert H Hemphill
Credit Manager of Federal Reserve Bank of Atlanta, 1934

'কি ভয়ংকর ব্যাপার! আমরা ব্যাংকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল! রাষ্ট্রের প্রতিটি পয়সাই কোনো না কোনো ব্যক্তিকে ঋণ নিতে হবে, ক্যাশ কিংবা ক্রেডিট হিসেবে। ব্যাংক যদি প্রচুর পরিমাণ ভেলকি মুদ্রা তৈরি করে, আমরা স্বচ্ছল থাকব, আর এমনটি না করলে আমরা বিপদে পড়ব। অর্থাৎ, আমরা সম্পূর্ণ রূপেই একটা স্থায়ী মুদ্রাব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত।

কেউ যখন একবার পুরো ব্যাপারটা ধরতে পারে, সে তখনই বুঝতে পারে আমাদের অবস্থা কতটা অবিশ্বাস্য রকম নাজুক এবং হতাশাজনক। কিন্তু এটাই সত্য। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য এখন এটা নিয়েই চিন্তা ও গবেষণা করাটা সবচেয়ে জরুরি। এটা এতটাই জরুরি যে লোকজন যদি এটা না বুঝে ও এই ব্যাপারটা সমাধানের পথ বের না করে, তাহলে আমাদের বর্তমান সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'

— রবার্ট হেম্ফিল
ক্রেডিট ম্যানেজার, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অফ আটলান্টা (১৯৩৪)

এক আনায় ছয় আনা

ফ্রাকশনাল রিজার্ভ পদ্ধতি নিয়ে আরেকটু গভীরে আলোচনা করা যাক। আমি স্টকহোম ব্যাংকে ১০০ মোহর জমা রাখলাম। তার বিনিময়ে পেলাম ১০০ মোহরের একটি নোট। এবার স্টকহোম ব্যাংক আমার সোনার মুদ্রাকে পুঁজি করে আরও ৬০০ সোনার মুদ্রার নোট তৈরি করে ঋণ দিয়ে দিল। তাহলে ব্যাংক কি সোনা উৎপাদন করল? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। আমি কষ্টে অর্জিত ১০০ সোনার মুদ্রার বিনিময়ে যা পাই, কেবল মাত্র সিন্দুকে তালা মেরে আমারই মোহর দিয়ে ব্যাংক সেরকম আরও ৬টি নোট পায়। এদের প্রত্যেকটির বিনিময় মূল্য আমার অর্জনের সমপরিমাণ!

জমির দলিল থাকা যেমন জমি থাকার সমান, ঠিক তেমনি সোনার মুদ্রা হাতে থাকা এবং সোনার মুদ্রার নোট হাতে থাকা প্রায় একই সমান। তাই স্টকহোম ব্যাংক ৬০০টি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে যেই সুদ পেত, বর্তমানে কোনো পুঁজি ছাড়াই ৬টি নোটের বিনিময়ে সেই পরিমাণ সুদ অর্জন করবে। তাই নোট উৎপাদন সোনা উৎপাদনের মতই কার্যকরী।

সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ালো ব্যাংক একটি সোনার খনি। আর তা সম্ভব হয়েছে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং এর জাদুতে টাকা ছাপানোর ক্ষমতার ফলে। ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং নীতিতে এমনটি করা সম্ভব হতো না। আমরা অর্থনীতির বইতে যখন ব্যাংকিং নিয়ে পড়ি তখন মূলত ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং নিয়েই পড়াশোনা করে থাকি। প্রাত্যহিক জীবনেও যখন আমরা ব্যাংক সম্পর্কে কল্পনা করি তখন ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিংই কল্পনা করি। কিন্তু আসলে সব ব্যাংকই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংক। আর একারণেই ব্যাংকের ক্ষতি সম্পর্কে অর্থনীতির ছাত্ররা অসচেতন। অপর দিকে যারা ব্যাংকে চাকরি করেন, তারাও ক্যারিয়ারের কথা ভেবে ভেবেই জীবন পার করে দেন। অর্থনীতির উপর ব্যাংক ব্যবসার প্রভাব নিয়ে মাথা ঘামান না। অনেকে মনে মনে ভাবেন বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা আগের যুগের ক্ষতিকর সুদের মত নয়। কেউ কেউ আবার এমন ধারণা পোষণ করেন যে বর্তমান ব্যাংকিং ও মুদ্রাব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা ইসলামী আবেগের জায়গা থেকে বলা। এর সাথে অর্থনীতির তত্ত্ব ও তথ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন বই মাত্রই ইসলামী অর্থনীতির বই।

এই ধারণাগুলো খুব ভালোভাবেই ভুল। বর্তমান মুদ্রা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিন্দু-খ্রিস্টান, বৌদ্ধ-নাস্তিক, নারী-পুরুষ সকলের জন্য একটি মরণ ফাঁদ, এর সাথে বিশেষ কোন ধর্মীয় আবেগের সম্পর্ক অস্তিত্বহীন। এই বইতে তাই ব্যক্তিগত আবেগ, বিশ্বাস বা মতামতের কোনো স্থান দেওয়া হয়নি।[২৪]

সীমা পরিসীমা

ব্যাংক নোট বা টাকার আবিষ্কার হওয়ার পরেও মানুষ কেবল বড়সড় লেনদেন নোট দিয়ে করতো। বাদবাকি সকল ক্ষেত্রে নোটের চাহিদা ছিল সীমিত। তাই ব্যাংক চাইলেই যত ইচ্ছা তত নোট লিখতে সক্ষম ছিল না, একটি সীমা ছিল। ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ বা আংশিক সঞ্চয়ের একটি অদৃশ্য সীমানা রক্ষা করাটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। অতি লোভে বেশি নোট ইস্যু করলে ঝুঁকি প্রচণ্ড বেড়ে যেত। কারণ বেশি নোট ইস্যু হলে সবাই একটু একটু করে সোনা তুললেও সিন্দুক খালি হয়ে যেত। আবার মাথাপিছু অল্প ঋণ বিফলে গেলেও

২৪ আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে কোন ইসলামি সোর্স থেকে এসকল জ্ঞান অর্জন করিনি। এই বিষয়ে আমার জ্ঞানের প্রায় সম্পূর্ণটাই অমুসলিম পশ্চিমা অর্থনীতিবীদদের হাত থেকে পাওয়া।

ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যেত। তাই ঋণের বোঝা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া বা অতিরিক্ত টাকা ছাপানো একটি ব্যাংকের জন্য ছিল দুর্বলতার প্রতীক। অপরপক্ষে, ব্যাংকের রিজার্ভ বেশি থাকা এবং ঋণ কম থাকা ছিল অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্যের প্রতীক। কথাগুলো বর্তমান যুগেও সত্য। তবে অতীতের সাথে বর্তমানের একটি পার্থক্য হচ্ছে সেই সময় প্রত্যেকটি ব্যাংকের নিজস্ব নোট ছিল। বর্তমানের মত কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ছিল না। তাই একই সাথে বিভিন্ন রকমের নোট বাজারে চলাচল করত। যেই ব্যাংকের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য যত ভালো ছিল সেই ব্যাংকের নোটের গ্রহণযোগ্যতা ছিল তত বেশি। আর যেই ব্যাংকের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য যত খারাপ ছিল সেই ব্যাংকের নোটের গ্রহণযোগ্যতা ছিল তত কম। আরেকটি মজার ব্যপার হচ্ছে একজন বিক্রেতা চাইলে ব্যাংক নোট ফিরিয়ে দিতে পারতেন বা সরাসরি স্বর্ণ মুদ্রা চাইতে পারতেন অথবা পছন্দসই ব্যাংকের নোট দাবি করতে পারতেন। যেমন আপনার কাছে ইয়র্কশায়ার ব্যাংকের নোট আছে। কিন্তু সম্প্রতি ইয়র্কশায়ার ব্যাংকের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে। আপনি সেই ব্যাংকের ১০ মোহরের একটি নোটের বিনিময়ে কিছু কিনতে গেলে বিক্রেতা আপনার নোট ফিরিয়ে দিতে পারবেন অথবা বলেও বসতে পারবেন যে এই ব্যাংকের ১৫ মোহরের নোট দেয়া লাগবে, তবে লন্ডন ব্যাংকের ১০ মোহরের নোট দিলেই চলবে। এক্ষেত্রে ক্রেতার কোনো অধিকার ছিল না। সেজন্য সব ব্যাংকের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিয়ে সঠিক ব্যাংকে টাকা জমা রাখা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[২৫]

ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং এর সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু ব্যাংক স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করে। অনেকেই বেশি পরিমাণ নোট ছাপিয়ে ঋণ দিতে থাকে। এদিকে ভেতরের অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে মানুষ ধেয়ে আসতো সোনা উঠিয়ে নিতে। এভাবে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে পড়তো। আবার একটি ব্যাংক দেউলিয়া হলে বাকি ব্যাংকের গ্রাহকদেরও টনক নড়ে উঠতো। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যাংকের থেকে সোনা তুলতে দিতো রেসে দৌড়। কিন্তু গ্রাহকরা যতই দৌড়াদৌড়ি করতো না কেন, ফ্রেকশনাল রিজার্ভ এর কারণে নোটের সমপরিমাণ সোনা সিন্দুকেই থাকতো না। ফলে সমগ্র অঞ্চলে মুদ্রা কেন্দ্রিক সমস্যা শুরু হয়ে যেত। এই সমস্যার কারণে একাধিকবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন ১৬৬০ সালে

২৫ লক্ষ্য করুন কিভাবে ব্যাংক এসে মানুষের সঞ্চয় অনিরাপদ করে দিল।

সুইডেনে। সে সময় যে পরিমাণ সোনা ব্যাংকে ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ নোট মার্কেটে আছে দেখে সবাই সন্দেহ করা শুরু করলো। তারপর গ্রাহকরা ব্যাংকের কাছে গেল নিজ নিজ মোহর বুঝে নিতে। ফলাফলস্বরূপ সুইডেনের অর্থনীতিই ধ্বসে যায়।

এভাবে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেখে ব্যাংকার রা মিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে, যার কাজ ছিল সদস্য ব্যাংকের কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা। আবার একই সাথে সদস্য ব্যাংকের জন্য আইন করা হয় কি পরিমাণ রিজার্ভের বিপরীতে কি পরিমাণ ঋণ দেওয়া যাবে (বা নোট ইস্যু করা যাবে)।

এই পর্যন্ত পড়া ইতিহাসের আলোকে আমরা বলতে পারি মুদ্রাব্যবস্থা সরকার থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা একটি প্রক্রিয়া। সোনার মুদ্রা তৈরি হয় খনি থেকে। আর কাগুজে মুদ্রা তৈরি হয় ব্যাংক থেকে। এই উভয়ের সাথেই সরকারের কোনো সংযোগ নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথেও সরকারের কোনো সংযোগ নেই। বড় বড় সব ব্যাংকার একত্র হয়ে তৈরি করে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা সকল সদস্য ব্যাংকের অভিভাবক। অন্য সবার মত সরকার বা রাজ্যের রাজাও নিজ ইচ্ছা মতন টাকা ছাপাতে পারে না। তাদেরকে ঋণ নিতে ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হয়। টাকা ছাপানোর ক্ষমতা নেই বলেই সরকার যখন রাস্তা, সেতু বা হাসপাতাল তৈরি করে, তখন কর এবং শুল্ক আদায় করে ব্যয়ভার বহন করে। কোনো বছর সরকারে আয় সেই বছরের ব্যয় অপেক্ষা কম হলে সরকার ঋণ গ্রহণ করে। আবার কোনো বছরের আয় সেই বছরের ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে বাড়তি অর্থ দিয়ে পূর্বের ঋণ শোধ করে অথবা ভবিষ্যত ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। সরকার নিজে টাকা ছাপাতে পারলে কর আদায় করার বা ঋণ নেবার প্রয়োজন পড়তো না।

'When a government is dependent upon bankers for money, they and not the leaders of the government control the situation, since the hand that gives is above the hand that takes. Money has no motherland; financiers are without patriotism and without decency; their sole object is gain.'

— Napoleon Bonaparte
French Military and Political Leader

একটা দেশের সরকার যখন ব্যাংকারদের কাছে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ব্যাংকাররাই তখন দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে, সরকার নয়। কারণ, দাতার হাত উপরে থাকে। টাকার যেমন দেশ নেই; ব্যাংকারদেরও তেমন দেশপ্রেম

নেই। আর নেই কোনো পরিমিতিবোধ; তাদের একমাত্র লক্ষ্যই হল মুনাফা করা।'

–নেপোলিয়ান বোনাপার্ট
ফ্রেঞ্চ সেনাপ্রধান ও রাজনীতিবিদ

'The modern banking system manufactures money out of nothing. The process is perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented.'

— Josiah Charles Stamp

1st Baron Stamp, English industrialist, Economist, Civil Servant, Statistician, Writer, and Banker. He was a director of the Bank of England and Chairman of the London, Midland and Scottish Railway.

'আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা শূন্য থেকে টাকা তৈরি করে। এটা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল ধোঁকাবাজির মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ধোঁকাবাজি।'

— জোসিয়া স্ট্যাম্প

১ম ব্যারন স্ট্যাম্প, ইংরেজ শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদ, আমলা, পরিসংখ্যানবিদ, লেখক ও ব্যাংকার। তিনি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড-এর একজন ডিরেক্টর এবং লন্ডন-মিডল্যান্ড-স্কটিশ রেলওয়ের চেয়ারম্যান ছিলেন

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন রকম নোট ইস্যু করাতে লেনদেন করা খুব সমস্যাজনক হয়ে গেল। কেউ যখন দূরের কোনো শহরে ঘুরতে যেত তখন তিনি নিজ শহরের ব্যাংক নোট কাজে লাগাতে পারতেন না। আর কোনো ব্যাংক যদি দেউলিয়া হয়ে পড়ত সেই ব্যাংকের নোটটাই অচল হয়ে যেত। বাজারে সব রকম নোট একসাথে চলাচল করাতে কোনো ব্যাংকের অবস্থা কেমন তা জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও ছিল কঠিন দায়িত্ব।

এজাতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলাদা আলাদা অস্থায়ী নোটের স্থলে সারা দেশে একটি স্থায়ী সাধারণ নোট তৈরি করার পরিকল্পনা নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যার নাম দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটের সাথেও সরকারের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমেই এই নোট তৈরি করা হয়।

প্রথম যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট বাজারে আনা হলো তখন অন্যান্য ব্যাংকের নোটও পাশাপাশি চালু ছিল। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সব ব্যাংক কে এক ছাতার নিচে আনা হয়। তারপরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটকে একমাত্র legal tender হিসেবে ঘোষণা করা হল। এজন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটের গায়ে লেখা থাকে 'চাহিবা মাত্র ইহার বাহক কে, দিতে বাধ্য থাকিবে।' অর্থাৎ, এখন থেকে আর কোনো বিক্রেতা এই নোট ফিরিয়ে দিতে পারবে না, গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। তাই নোট ফিরিয়ে কোনো পণ্যের সোনাতে মূল্য পরিশোধ চাওয়ার কোনো উপায় নেই। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এই গ্যারান্টি প্রদান করা ছিল যে, কেউ চাইলেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গিয়ে নোট ভাঙ্গিয়ে সমপরিমাণ সোনা তুলে নিতে পারবে। এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটের ইতিহাস। এভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সারাদেশে লেনদেনের একটি সাধারণ নোট নিয়ে আনলো।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সুইডেনের রিকস বাংক বা Riksbank (সুইডিস ভাষায় ব্যাংককে বাংক বলে)। পরবর্তী এই ব্যাংকের আদলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে উঠে। এগুলো সবগুলোই ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তাদের নিজ নিজ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করে ফেলে। তবে এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আমেরিকা ছাড়াও পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

সোনা-রূপার মায়া কাটিয়ে কাগজভিত্তিক মুদ্রা

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট, সেই দিনটি ছিল রবিবার। টিভি পর্দায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন গম্ভীর মুখে আবির্ভূত হলেন অত্যন্ত জরুরি একটি ঘোষণা নিয়ে। কেউ ভাবতেও পারেনি কি ঘোষণা আসতে যাচ্ছে। খুব গম্ভীর মুখে স্ক্রিপ্ট পড়তে পড়তে তিনি জানিয়ে দিলেন, আজকে থেকে স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা স্থগিত ঘোষণা করা হল। সেই একটি খবর পৃথিবীর সবাইকে এতটাই হতবাক করেছিল যে, সিদ্ধান্তটি নিক্সন শক (Nixon Shock) হিসেবে বিখ্যাত।[১২]

১২ https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/nixon-shock/

কিন্তু কেন ঘটেছিল এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি আর সেটার প্রভাবটাইবা ছিল কেমন?

সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। প্রলয়ঙ্করী সেই যুদ্ধের আর্থিক ক্ষতি সবাইকেই স্পর্শ করছিল। বিশ্বযুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিতে হচ্ছিল। যুদ্ধ কবে শেষ হবে কেউ জানে না, কিন্তু ঋণ নিতে গিয়ে আর পরবর্তীকালে সেই ঋণ পরিশোধ করার হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেল এই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর স্বর্ণের মজুদ অনেক কমে গিয়েছে এবং এই অবস্থায় তাদের মুদ্রার বিপরীতে পর্যাপ্ত স্বর্ণ মজুদ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

বিশ্বযুদ্ধের সেই সংকটের মধ্যেই স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা ধরে রাখার জন্য ১৯৪৪ সালে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ার এর ব্রেটন উডস নামক স্থানে ৪৪টা মিত্র দেশের মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে, একমাত্র মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ মজুদ থাকবে। ঠিক হয় যে, প্রতি ৩৫ ডলারের বিপরীতে ১ আউন্স স্বর্ণ মজুদ থাকবে এবং বাদ বাকি সব মুদ্রার মান মার্কিন ডলার এর বিপরীতে নির্ধারিত হবে। এই চুক্তির কারণে অন্য সব রাষ্ট্র তাদের মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণ মজুদ রাখার দায় থেকে মুক্তি পেল ও আমেরিকা ব্যতিত সব রাষ্ট্রের জন্য স্বর্ণের মজুদ ডলার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হল। অর্থাৎ, এই সিদ্ধান্তের প্রভাবে মার্কিন ডলারই হয়ে দাঁড়ায় সোনার বিকল্প ও মার্কিন ডলার অচিরেই আন্তর্জাতিক 'রিজার্ভ কারেন্সি' বা মজুদ মুদ্রাতে পরিণত হয়।

কিন্তু আমেরিকা তার কথা রাখেনি, আসলে রাখতে পারেনি। চুক্তির সময়ে সোনার মজুদে ভরপুর আমেরিকা টের পায়নি কত ধানে কত চাল। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, দিন আরো গড়াল, ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু করলো আমেরিকা, যুদ্ধ করতে টাকা প্রয়োজন। এই টাকা আসবে কোথা থেকে। সহজ সমাধান হচ্ছে নতুন নোট ছাপানো। সব মিলিয়ে মার্কিনিরা ডলার ছাপাতে থাকে[১৩] আর অতিরিক্ত মার্কিন ডলার ছাপানোর ফলে স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের দাম হু-হু করে পড়তে থাকে। এমনকি ১৯৭১ সালে মার্কিন ডলারের দাম প্রতি আউন্স স্বর্ণের বিপরীতে ২০০ ডলারের নেমে আসে।

১৩ তাছাড়া ব্যাংক ক্রেডিট মানি তো আছেই।

১৪ 3https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3545&context=faculty–scholarship

ডলারের এই পড়তি দামের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের দেশগুলোর অসন্তুষ্টি বাড়তে থাকে। সেসব দেশ তখন তাদের কাছে মজুদ থাকা ডলার ভাঙ্গিয়ে স্বর্ণ দাবি করে বসে আমেরিকার কাছে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের শুরুতে তৎকালীন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জেস পম্পিদিউ ডলার ভাঙ্গিয়ে নিরাপদে সোনা নেওয়ার জন্য আমেরিকাতে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠান।

এর পরপরই আগস্টের ১১ তারিখ তৎকালীন ব্রিটিশ ট্রেজারি অনুরোধ করে যে, আমেরিকা যেন ব্রিটেনের পাওনা ৩ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ স্বর্ণ ফোর্ট নক্স থেকে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে নিয়ে রাখে। সেই সময়ে আমেরিকা নিজের স্বর্ণ রাখত ফোর্ট নক্সে আর অন্য দেশের স্বর্ণ রাখত নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে। আমেরিকা অনুরোধ শুনেই বুঝে ফেলে যে ব্রিটেন, যাদের সাথে বসে তারা ব্রেটন উডস চুক্তি করেছে, তারাই এখন স্বর্ণ উঠিয়ে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন ১৫ আগস্ট পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে, তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন স্বর্ণের মজুদ ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করে দেন।

এই এক ঘোষণার ফলে মার্কিন ডলার এবং তার সাথে সাথে পৃথিবীর সব মুদ্রা ফিয়াট কারেন্সিতে পরিণত হয়, অর্থাৎ বর্তমানে বিশ্বে কোনো মুদ্রার বিপরীতে মূল্যবান সম্পদ জমা রাখা নেই। মুদ্রা এখন নিজেই নিজের মূল্যমান।

মার্কিনিরা মুদ্রার মূল্যের সাথে মুদ্রার মূল্যমান আলাদা করতে সাহায্য করেছে মাত্র। কারণ, এই কাছাকাছি সময়েই একাধিকবার ব্যাংকে টাকা রেখে সেই টাকার 'টোকেন' দেখিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রচলন করার চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তি ছিল যে, মুদ্রা শুধুই 'বিনিময়ের মাধ্যম', এটাকে কেন 'মূল্যবান' হতে হবে? নিক্সন শক আসলে ঝাঁকি দিয়ে পুরো বিশ্বকে এই দর্শনের আওতায় নিয়ে চলে এসেছে।

এখন আমরা 'শুধু কাগজ' দিয়েই কাজ সারি। আর ধাতব মুদ্রা খুচরা পয়সা হিসেবেই চলছে।

আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা

টাকা কোথা থেকে আসে সেই তথ্য আমাদের হাতের মুঠোতেই আছে। আপনার হাতের নোটটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এর গায়ে লেখা আছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট। অর্থাৎ, টাকা আসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই টাকা উৎপাদন করে কিসের ভিত্তিতে?

প্রথম যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট বাজারে এসেছিল তখন নিয়ম ছিল কেউ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গিয়ে নোটের বিপরীতে চাইলেই সোনা তুলে আনতে পারবে। অর্থাৎ, সোনার মজুদের ভিত্তিতে নোট তৈরি করা হয়েছিল। এজন্য এখনও অনেকে মনে করেন বর্তমানে টাকার বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গোপন কুঠুরিতে স্বর্ণ বা রৌপ্য রিজার্ভ আছে। চাইলেই যে কেউ গিয়ে তা তুলে আনতে পারবে। এই ধারণা যে সঠিক নয় তা আপনারা ইতিমধ্যেই নিক্সন শকের ইতিহাস পড়ার কল্যাণে জেনে গেছেন।[২৬]

খেয়াল করুন, প্রথমে সবাই নিজ নিজ সোনা ব্যাংকে রেখে তার বিপরীতে নোট হাতে পেল। তারপরে এই সোনার বিপরীতে ব্যাংকাররা মিলে একটি সাধারণ নোট বাজারে আনলো। তখনও হাতের নোটের বিনিময়ে মানুষ সোনা তুলতে পারতো। তারপরে একদিন নোটের বিপরীতে সোনা তোলার ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হলো। এভাবে এক ফালি কাগজের বিনিময়ে ব্যাংক সব মানুষের জমাকৃত সোনা কৌশলে দখল করে নিল। এই ঘটনাকেই বলা হয়ে থাকে সুক্ষ্ম কৌশলে ব্যাংক কর্তৃক জনগণের সোনা চুরি করে নেওয়া।

সোনার মজুদ ব্যবস্থা ধ্বংস করার পর সব টাকা নিরেট কাগুজে মুদ্রা বা ফিয়াট মানিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে যত ইচ্ছা তত টাকা ছাপাতে পারে। একটি ছাপাখানাতে যেমন যত ইচ্ছা তত কপি বই ছাপানো যায়, ঠিক তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকেও যত ইচ্ছা তত কাগজের টাকা ছাপানো যায়। এই স্বাধীনতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আছে। আপনার কাছে সবকিছু শুনতে অবাক লাগলে বিচলিত হবেন না, প্রথমবার এই কথা শুনলে কম বেশি সবাই-ই এমন অবাক হয়। তবে আপনি হয়তো আরও অবাক হবেন জেনে যে বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট = ঋণ।

শুভঙ্করের ফাঁকি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি ছিটিয়ে ছিটিয়ে কাউকে টাকা দান করে ? না, তা করে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আপনাকে, আমাকে কিংবা দেশের সরকারকে টাকা দান করে না। তাহলে কি করে? ঋণ দেয়। কাকে ঋণ দেয়? সরকারকে অথবা বাণিজ্যিক ব্যাংককে। এই ঋণের টাকা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করলে বাজারে নতুন টাকা প্রবেশ করে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সব

২৬ বর্তমান যুগের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সোনার রিজার্ভ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।

'প্রাথমিক' টাকার মালিক যা আমাদেরকে শুধু ব্যবহার করার জন্য সে ধার দেয়। এই ব্যবস্থার মাঝে লুকিয়ে থাকা শুভঙ্করের ফাঁকিটা আপনাদের চোখে পড়েছে কি?

দেখুন, একটি অর্থনীতির সব টাকাই যদি ঋণ হিসেবে প্রবেশ করে, সব ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া মানে হচ্ছে দেশে কোনো টাকাই নেই। আর টাকা ছাড়া যেহেতু একটি দেশ চলতে পারে না এর মানে দাঁড়াচ্ছে কোনো দেশই ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। এই দুঃখজনক ব্যবস্থার দ্বিতীয় শুভঙ্করের ফাঁকিটা কি আপনাদের চোখে পড়েছে?

ভেবে দেখুন, কেবল ঋণ হিসেবে টাকা দেওয়ার মানে হচ্ছে কিছুদিন পরেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই টাকা সুদে আসলে ফেরত নিচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া কেউ যদি টাকা ছাপাতে না পারে এই ঋণের সুদ পূরণ হবে কোথা থেকে? পৃথিবীতে কেবলমাত্র আমিই যদি হীরার মুদ্রা তৈরি করতে পারি আর ১০টি হীরার মুদ্রা ধার দিয়ে এক বছরান্তে ১২টি হীরার মুদ্রা ফেরত চাই নতুন দুটি মুদ্রা আসবে কোথা থেকে?

নিশ্চয়ই তা আমাকেই তৈরি করে ঋণ দিতে হবে। ঠিক তেমনি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি টাকা ছাপিয়ে ঋণ দেয় এবং পরবর্তীকালে সব ঋণ সুদে আসলে ফেরত চায়, সুদ কোথা থেকে পূরণ হবে? উত্তর হচ্ছে আমাদেরকে ব্যাংক থেকে পুনরায় বাড়তি ঋণ নিতে হবে। বাড়তি ঋণ নিলেই কেবল নতুন টাকা ছাপানো হবে। আর একমাত্র এভাবে পুরোনো ঋণের সুদ পরিশোধ করা যাবে। এদিকে নতুন ঋণের উপর যেহেতু সুদ যুক্ত আছে, পরের বছর আরও বেশি পরিমাণে ঋণ নিয়ে সুদ পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ, কোনোদিন আসল পরিশোধ হবে না এবং মোট ঋণের পরিমাণ চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাই আমরা ঋণের উপর বেঁচে থাকব তো বটেই, কালক্রমে এই ঋণের বোঝা বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

'if there were no debts in our money system, there wouldn't be any money.'

— *Marriner Eccles*

American Banker, Economist, and Member & Chairman of the Federal Reserve Board.

'কারো কাছে কোনো প্রকার ঋণ না থাকলে দেশে একটি টাকাই থাকতো না'

— *মারিনার একলস*

আমেরিকান ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ এবং ফেডারেল রিসার্ভ বোর্ডের মেম্বার ও চেয়ারম্যান

আধুনিক বিশ্ব

সোনার মোহর চালু থাকা অবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সোনার রিজার্ভের বিপরীতে কাগজের নোট ইস্যু করতো। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সব কাগজের নোট ছাপাচ্ছে দেখে কি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মুদ্রা তৈরি বন্ধ করে দিয়েছে?

না, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো টাকা ছাপানো বন্ধ করেনি। তারা এখন ব্যাংক নোটের বিপরীতে ইস্যু করছে হাওয়াই টাকা। জি, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এখন কাগুজে নোটের বিপরীতে ক্রেডিট মানি বা হাওয়াই টাকা বাজারে ছাড়ছে (অনেকে একে ইলেক্ট্রনিক মানি বলে)। একসময় ইউরোপের স্বর্ণকাররা যেমন অদৃশ্য স্বর্ণের বিপরীতে কিছু কাগজের নোট লিখে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি করে বর্তমানে সারা বিশ্বের ব্যাংকগুলো টাকার বিপরীতে টাকা ছাড়াই কিছু ডিপোজিট লিখে দিচ্ছে। এই ব্যাপারটি কিভাবে কাজ করে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছি। তবে তার আগে দেখে নেই আধুনিক বিশ্বে মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট বা গুনোত্তর বৃদ্ধি কিভাবে কাজ করছে?

ধরুন, চীনের শেনজেনে অফিস খুলে আপনি একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলেন। তার নাম দিলেন 'ইও ছিয়ান' ব্যাংক। এখন শেনজেন শহরের ১১টি কর্পোরেশনের মধ্যে মোট দশটি কর্পোরেশন ১০ মিলিয়ন করে মোট ১০০ মিলিয়ন টাকা ইও ছিয়ান ব্যাংকে জমা দিল। এখন যদি গণনা করা হয় কর্পোরেশনগুলোর হাতে মোট কত মিলিয়ন টাকা আছে, ১০টি কোম্পানি বলবে ব্যাংকে ১০ মিলিয়ন টাকা আছে। অর্থাৎ, মোট ১০০ মিলিয়ন টাকা জমা আছে, যেকোনো কোম্পানি চাইলেই সেই মুদ্রা তুলে আনতে পারবে ব্যাংক এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে (মিথ্যা প্রতিশ্রুতি)। তবে টাকা তুলে আনার ভেজাল করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ, এক অ্যাকাউন্ট থেকে অপর অ্যাকাউন্টে লেনদেন করেই সব কাজ সারা যাবে। অর্থাৎ, টাকা ব্যাংকের ভল্টে জমা থাকুক কি ঋণ দেওয়া হয়ে থাকুক, সবমিলিয়ে একই রকম সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। তাই যেখানেই টাকা থাকুক না কেন, কোনো সমস্যা নেই। এদিকে অলস টাকা ব্যাংকে পড়ে আছে দেখে আপনি ১১তম কর্পোরেশনকে মোট ৯০ মিলিয়ন টাকা ঋণ দিয়ে দিলেন। এবারে ১১ তম

কর্পোরেশনকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাদের কত টাকা আছে?' উত্তরে তারা বলবে ৯০ মিলিয়ন টাকা আছে। এভাবে মোট টাকা হয়ে গেল ১৯০ মিলিয়ন, যদিও ব্যাংক শুরু করা হয়েছিল ১০০ মিলিয়ন দিয়ে। দুই ভাবে হিসেবের ফলাফল দুই রকম আসছে। তাহলে সমাজে প্রকৃতপক্ষে কত টাকা আছে?

আপনি যদি টাকার সংজ্ঞা খুব কঠোর করে নির্ধারণ করতে চান তাহলে মোট টাকা আছে ১০০ মিলিয়ন। কিন্তু অর্থনীতিবিদগণ এই সংজ্ঞা ব্যবহার করেন না। কারণ, ব্যাংক ডিপোজিট মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাই একেবারে কাঁচা টাকাকে M0 এবং কাঁচা টাকা + ডিপোজিটকে একত্রে M1 ধরা হয়। ঠিক এভাবেই একটি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে যখন আমরা টাকা রাখি এবং ব্যাংক সেখান থেকে কাউকে ঋণ দেয়, এভাবে নতুন টাকার সৃষ্টি হয়। তাই প্রতিটি দেশে M1, M0 থেকে বেশি হয়।

এবার আসা যাক পরবর্তী ধাপে। শেনজেনে ফিরে আসি। ঋণ নেবার পরে এগারোতম কর্পোরেশন ৯০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করল। এভাবে টাকাগুলো অপরাপর নাগরিকদের হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ল। এবারে তারা ব্যাংকে নতুন করে টাকা জমা দিলেন। সব মিলিয়ে ৮০ মিলিয়ন টাকা ঘুরে ফিরে ব্যাংকের এসে জমা হলো। যেহেতু টাকা অলস পড়ে আছে, তাই আবারো ব্যাংক ঋণ দিয়ে দিল। আবারো ঘুরেফিরে ৭০ মিলিয়ন টাকা ফেরত আসলো। এবার সেই মুদ্রা ব্যাংক আবার ঋণ দিল, তারপরে আবারো ৬০ মিলিয়ন ফেরত আসলো। এভাবে ৫০, ৪০, ৩০, ২০, ১০ এমন করে ফেরত আসতে থাকল। এই চক্র এখানে শেষ করলে মাত্র ১০০ মিলিয়ন টাকা থেকে ব্যাংকিং সিস্টেমের জাদুতে মোট ৫৫০ মিলিয়ন টাকা করে ফেলা হলো, যাকে বলে মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট।

মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট কি তা তো বুঝলেন। কিন্তু এর থেকে আরও লাভজনক একটি উপায় আছে, সেইটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ বা আংশিক সঞ্চয়। খেয়াল করে দেখুন, উপরের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যাংকার ভল্টের থেকে কাঁচা টাকা তুলে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দিয়ে সিন্দুক খালি করে ফেলছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। স্বর্ণের যুগে স্বর্ণকার যেমন অলস স্বর্ণ সিন্দুকে রেখে তার বিপরীতে নতুন নতুন নোট লিখে দিত ঠিক তেমনি বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলোও অলস টাকার বিপরীতে নতুন ব্যালেন্স তৈরি করে গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে দেয়। সোজা বাংলায় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে ঋণ দেয় (ইলেকট্রনিক মানি)। যদি আপনি বা আমি টাকা ছাপাই তাহলে তা অবৈধ।

কিন্তু ব্যাংক যদি একই কাজ করে তাহলে তা বৈধ! এ কারণেই ব্যাংক এত লাভ করতে পারে। তবে কি পরিমাণ জমার বিনিময়ে ব্যাংক কি পরিমাণ হাওয়াই টাকা বা ক্রেডিট সৃষ্টি করতে পারবে তার একটি সীমা আছে। এই সীমা দিন দিন কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

এবারে আলোচনা করা যাক আধুনিক বিশ্বে আংশিক সঞ্চয় বা ফ্র্যাকশনাল ব্যাংকিং কিভাবে কাজ করছে। বিষয়টি বুঝতে আমরা একটি উদাহরণ নিয়ে আসি। চিন্তা করুন, বিকাশ ব্যাংকে একজন আমানতকারী ১০ লাখ টাকা জমা রেখেছে। অতপর মোনেম গ্রুপ বিকাশ ব্যাংকের কাছ থেকে ১ কোটি টাকা লোন চাইলো।

সেই মোতাবেক ব্যাংকও এক কোটি টাকার ঋণ লিখে নির্মাণ ব্যবসায়ী মোনেম গ্রুপের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিল। ১০ লাখ টাকা কিন্তু ভল্টেই পড়ে আছে, কোন নড়চড় হয়নি। মাঝখান দিয়ে নতুন এক কোটি টাকা তৈরি হয়ে গেল, তারপর তা সুদের উপর ঋণ দেয়া হয়ে গেল। এবারে মোনেম গ্রুপ যখন বাড়ি তৈরি করতে বালু কিনতে গেল তখন এত টাকাটা বালু ব্যবসায়ীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইলেক্ট্রিক ট্রান্সফার করে দিল।

এখন বালুর ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্ট এবং মোনেম গ্রুপের অ্যাকাউন্ট যদি এক ব্যাংকেই হয়ে থাকে, তাহলে কেবল নাম এবং নাম্বার অদল বদল করবে। যদিও সব হাওয়া, বালুর ব্যবসায়ী নিশ্চিত থাকবেন যে টাকাটা তার অ্যাকাউন্টে জমা আছে। আর যেহেতু নিশ্চিতই আছে, টাকা তুলে হাতে রাখার প্রশ্নই আসে না। পরবর্তীকালে তিনি নিজেও কেনাকাটা করার সময় ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে যাবেন না। বরং চেকে লেনদেন করে অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টে কাজ সেরে নিবেন। বালুর ব্যবসায়ী কিছু টাকা তুলে কোনো কাজে খরচ করলেও ব্যাংকের কোনো সমস্যা নেই। সবাইতো আর একসাথে সব টাকা তুলছেন না। তাছাড়া, কারো জরুরি প্রয়োজন পড়লে যেন তুলতে পারে সেরকম কিছু টাকা ভল্টে থাকে। বাদবাকি সব টাকা অদৃশ্য। কেবল হিসেব খাতায় নাম্বার লেখা থাকে এবং তার উপর সুদ আসতে থাকে।

এই সিস্টেমটা ভেঙে পড়ে যখন সবে একসাথে ক্যাশ করে। তখন ব্যাংক নিজেকে বন্ধ ঘোষণা করে, যেমনটা হয়েছিল ২০১১ সালে গ্রিসে এবং ২০২০ সালে লেবাননে।

এই সিস্টেম চালু থাকতে সবার অ্যাকাউন্ট যে একই ব্যাংকে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এক ব্যাংকে সবার অ্যাকাউন্ট থাকার মতই একটি ব্যাংকিং সিস্টেম একত্রে কাজ করে। যেমন সেভেন রিংস সিমেন্ট

কোম্পনির অ্যাকাউন্ট রূপালী ব্যাংকে খোলা হয়েছে। এখন মোনেম গ্রুপ সিমেন্ট কিনতে গেলে বিকাশ ব্যাংক থেকে হিসাব ট্রান্সফার হয়ে তা রূপালী ব্যাংকে প্রবেশ করবে। আবার দেখা গেল রূপালী ব্যাংকের একজন গ্রাহক জনতা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকা খামারির থেকে গরু কিনেছেন। তখন আবার কিছু টাকা জনতা ব্যাংকে চলে আসবে। এরপর দেখা যাবে জনতা ব্যাংকের কোনো একজন গ্রাহক বিকাশ ব্যাংকের একজন গ্রাহকের থেকেই পণ্য কিনলেন। এভাবে হিসাব কাটাকাটি হয়ে যাবে।

সব হিসাব ছবির মত সমানে সমানে কাটাকাটি না হলেও কোনো সমস্যা নাই। কারণ একটি অর্থনীতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে টাকা চালাচালি হতে থাকলেও পুরা ব্যাংকিং ব্যবস্থার হিসাব একই থাকবে। তাই কোনো ব্যাংকের জমা কমে যাওয়া মানে অপর একটি ব্যাংকের জমা বৃদ্ধি পাওয়া। তাই তারা নিজেদের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ হিসেবে টাকা লেনদেন করতে থাকবে। এভাবে এক এক দিন এক এক ব্যাংকের জমা কম বেশি হতে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ লেনদেন চলতে থাকে। বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে ঋণের আদান প্রদানের এরূপ সক্রিয় মার্কেট পৃথিবীর সব দেশেই আছে। বাংলাদেশে এই মার্কেটের নাম 'কল মানি মার্কেট'। এই আন্তঃব্যাংক সুদের হার বা কল মানি রেট নীতি নির্ধারকদের জন্যে একটি গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক ব্যারোমিটার।[২৭]

Multiplier Effect এবং Fractional Reserve আপনার মস্তিষ্কে একসাথে ধারণ করতে পারলে বুঝে যাবেন, ব্যাংকের ক্ষমতা কত প্রকার ও কি কি। আর হ্যাঁ, আগেও একটা কথা বলেছি, এবং আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে Multiplier Effect এবং Fractional Reserve Banking এর সাথে সায়েন্স এবং টেকনলজির কোনো সম্পর্ক নেই। সুন্দর করে হিসেব সংরক্ষণ করতে পারলে যেকোনো কাঠামোতে এই সিস্টেম বজায় রাখা সম্ভব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কারসাজি

বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে সবাই একসাথে টাকা তুলতে আসলে পুরো ব্যবস্থা ধ্বসে পড়বে। তবে বাস্তবে সবাই একসাথে

২৭ ব্যাংকিং সিস্টেমের 'কল মানি' রেট দেখলেই বুঝবেন এক ব্যাংক আরেক ব্যাংকে কত শতাংশ সুদে এই টাকা ধার দেয়। ঈদের সময় এই কল মানি রেট তুঙ্গে থাকে, কারণ সবাই তখন টাকা তুলে নিতে ব্যস্ত থাকে।

টাকা তুলতে আসে না দেখে এটি টিকে আছে। তারপরেও এমন ঘটনা অতীতে বহুবার ঘটেছে এবং জনগণকে তার চরম মূল্য দিতে হয়েছে। সেই থেকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্ম। বর্তমান বিশ্বে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পর্ক কি? ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধুনিক ক্রাইসিসগুলো কি কি? এবং এমন ক্রাইসিস মোকাবেলা করতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে? এখন আমরা তা আলোচনা করবো।

তারল্য সংকট

কখনও যদি এমন হয় যে একটি অর্থনীতিতে সব ব্যাংক থেকে গ্রাহকরা একসাথে বেশি বেশি টাকা তুলছেন, এই ঘটনাকে আমরা বলি তারল্য সংকট বা Liquidity Crisis. তারল্য সংকট ছোট আকৃতিতে হলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসে ব্যাংকিং সিস্টেমকে রক্ষা করতে নতুন টাকা ছাপিয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে টাকা প্রবেশ করাবে। প্রয়োজন পড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংককে সরাসরি ঋণ দিবে। এভাবে ব্যাংকিং সিস্টেমে টাকা প্রবেশ করতে থাকবে এবং তারল্য সংকট কেটে যাবে। এই সংকট যদি অনেক বড় পর্যায়ে ঘটে, যেমন সারা দেশে সবাই একসাথে টাকা তোলা শুরু করে, তখন কিছু করার থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে সব ব্যাংক প্রথমত নিজেকে বন্ধ ঘোষণা করে বা ক্যাশে টাকা তোলার উপর সীমা আরোপ করে ধীরে ধীরে সমাধানের চেষ্টা চালানো করে। এমন ঘটনাকে ইংরাজিতে বলে Bank Holiday.

এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল এড়ানোর জন্য কি পরিমাণ তারল্যের বিপরীতে একটি ব্যাংক কি পরিমাণ ঋণ ইস্যু করতে পারবে তার সীমারেখা নির্ধারণপূর্বক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেওয়া নীতিমালা থাকে। কোনো ব্যাংকের তারল্য এই নীতিমালায় প্রণীত সীমার নিচে চলে গেলে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। এভাবে ব্যাংকিং রিস্ক একটি সীমার মধ্যে রাখা হয় এবং সম্পূর্ণ সিস্টেমে চেক + ব্যালান্স বজায় থাকে।[২৮] কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাংকিং সিস্টেমের পৃষ্ঠপোষক। আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

২৮ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস শুরু হলে আর গাইডলাইন বজায় থাকে না এবং পুরো সিস্টেমই ঝুঁকির মুখে পড়ে যায়। সম্প্রতি কিছু দেশে যেমন লেবানন এবং গ্রিসে এমনটিই ঘটেছে।

ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়নে বাসেল কমিটি এবং মুদ্রাব্যবস্থা সচল রাখতে আইএমএফ কাজ করে যাচ্ছে।

পুঁজি ঘাটতি

এবারে আলোচনা করা যাক পুঁজি ঘাটতি (Capital Shortfall) নিয়ে। তারল্য সংকটের পাশাপাশি পুঁজির সংকটও একটি ব্যাংককে ধ্বসে ফেলতে পারে। ব্যাংকের গ্রাহকরা যদি ঋণ নেবার পরে ঋণ খেলাপ করতে থাকে তাহলে ব্যাংকের পুঁজি কমে যায়। কোনো ব্যাংকের পুঁজি কমে যখন শূন্য হয়ে যায় তখন ব্যাংকটি কার্যত দেউলিয়া হয়ে যায়।

ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যাক।

সালমান খান একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপক হারে ঋণ দিতে থাকল। ব্যাংকের পুঁজি যখন ছিল ৪০০ কোটি টাকা তখন খান সাহেব ১৩ জনকে ১০০ কোটি করে মোট ঋণ দিয়ে রাখল ১৩০০ কোটি টাকা। ঋণ বিফলে না গেলে এই ১৩০০ কোটি টাকার পুরোটাই ফেরত আসবে। আর সাথে আসবে বাড়তি সুদও। কিন্তু ঋণ ফেরত না আসলে?

ধরা যাক, ব্যাংক যেই ১৩ জনকে ঋণ দিয়েছিল তাদের তিন জন ঋণখেলাপি করেছে। পরবর্তীকালে সালমান খানের ব্যাংক তাদের থেকে কিছুই ফেরত পেল না। এই ৩০০ কোটি টাকা ব্যাংকের পুঁজি থেকে বাদ যাবে। সব মিলিয়ে পুঁজি কমে দাঁড়াবে ১০০ কোটি টাকায়। আর একজন গ্রাহক ঋণ খেলাপ করলেই ব্যাংক শেষ।

এই ঘটনার সাথে সাথে অন্যান্য ব্যাংকেরও টনক নড়ে উঠবে। কেউ সালমান খান কে ঋণ দিতে উৎসাহী হবে না। এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে খান সাহেবের প্রতি নোটিশ আসতে থাকবে পুঁজির অনুপাত বৃদ্ধি করার জন্য।

প্রথম বছর শেষে সালমান খান যদি ১০০ কোটি টাকা সুদ পান (সুদের হার ১০%), তাহলে তার পুঁজি বেড়ে হয়ে যাবে ১০০ + ১০০ = ২০০ কোটি টাকা। ধরি, হারানো ক্ষতি পোষাতে তিনি আবার দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন। যেহেতু ব্যাংকের পুঁজির অনুপাতের সর্বনিম্ন সীমা ৮%, তিনি এর সদ্ব্যবহার করে আরও ১৫০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে মোট ঋণের পরিমাণ ২৫০০ কোটিতে উন্নীত করলেন। ৮% এর পূর্ণ ব্যবহার। এই বছর কোনো ঋণ বিফলে না গেলে সুদ আসবে ২৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, পুঁজি বৃদ্ধি পেয়ে হবে ২০০ + ২৫০ = ৪৫০ কোটি টাকা।[২৯] এভাবে, পুঁজির অনুপাত বেড়ে হয়ে যাবে ১৮% এবং খুব দ্রুতই একটি ব্যাংক স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

---

২৯ এখন চাইলে ব্যাংক মোট ৬২৫০ কোটি টাকা ঋণ দিতে পারবে।

এমন যদি হত যে যখন ব্যাংকের পুঁজি ছিল ২০০ কোটি টাকা এবং মোট ঋণ ছিল ২৫০০ কোটি টাকা, তখন আরও দুজন ঋণখেলাপি করলে ব্যাংকের পুঁজি হয়ে যেত শূন্য। অর্থাৎ, ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যেত।

এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকার ব্যাংককে উদ্ধার করতে পারে (বা সময় বাড়িয়ে দিতে পারে)। ইংরেজিতে যাকে বলে বেইল আউট (Bail Out)। ঋণ সঠিক ভাবে ফেরত আসলে ব্যাংক খুব দ্রুতই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সাধারণত, ব্যাংকের জন্য ফিরে আসা কঠিন কিছু নয়। একবার চিন্তা করে দেখুন। ২,৪০০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ১,২০০ কোটি টাকাও যদি সুদ ছাড়া ফেরত আসে, তাতেও ব্যাংক লালে লাল। আর এটি কেবল আসলের হিসাব, বাস্তবে তো আসলের পাশাপাশি সুদও আসবে।

এবারে আলোচনা করা যাক সর্বশেষ প্রেক্ষাপট নিয়ে। একটি ব্যাংক প্রাথমিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে গেলেও যদি সরকার রক্ষা না করে তাহলে সেই ব্যাংকটি চূড়ান্ত পর্যায়ে দেউলিয়া হয়ে যাবে। তবে আমানতকারীদের ডেপোজিট রাষ্ট্র কর্তৃক বীমা করা থাকে। তাই সরকার ডেপোজিটরদের দায় শোধ করে দেয়। এভাবে বর্তমান ব্যবস্থায়, অপরাধ করে ব্যাংক, কিন্তু দায়ভার বহন করে সম্পূর্ণ জাতি।

মনেটারি পলিসি

বর্তমান বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো যে ঋণের উপরেই একটি জাতির ভাগ্য নির্ভর করে। ঋণের চাকা যতই ঘুরতে থাকে,ততই নতুন নতুন বিনিয়োগ হতে থাকে এবং সবার হাতে ক্রমান্বয়ে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঋণ বাড়তে থাকলে সবকিছু ভালোভাবে চলতে থাকে। তবে ঋণ বাড়াতে বাড়াতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর যখন ঋণ নেবার মতো যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন ঋণ গ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তিদেরকেও উচ্চ সুদের হারে ঋণ দেওয়া হয় (অর্থাৎ, ব্যাংক কর্তৃক অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রজেক্টে বিনিয়োগ করা হয়)। তবে একটি সীমার পরে বেশি বেশি ঋণ দেওয়া যায় না (অর্থাৎ, নতুন টাকা তৈরির ধারাটাও স্তিমিত হয়ে আসে)। যখন নতুন টাকার পরিমাণ কমে আসে তখন দেখা যায় পুরানো ঋণী ব্যক্তিরা সুদ-আসল পরিশোধ করার টাকাই জোগাড় করতে পারে না। তার কারণ, ঋণ = টাকা। নতুন টাকা উৎপাদন না হলে পুরানো দেনা+সুদ শোধ হবে

কিভাবে? তাই ঋণ ইস্যু কমে গেলে দেউলিয়াত্ব বেড়ে যায় এবং ডিফ্লেশন দেখা দেয়। এভাবে অর্থনৈতিক মন্দার অশুভ সূচনা শুরু হয়।

টাকার পরিমাণ কিভাবে কমে-বাড়ে এবং এর সাথে দেউলিয়াত্বের কী সম্পর্ক, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় অনেকেই বোঝে না কেন তারা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। কেউ নিজের ভাগ্যের দোষ দেয়, কেউ বা দোষ দেয় রাজনীতিক বা সরকারকে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে টাকার পরিমাণ (বা ঋণ) না বাড়লে গাণিতিকভাবেই নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ দেউলিয়া হয়ে যাবে। কে দেউলিয়াটা হবে শুধুমাত্র এটাই অস্পষ্ট, কিন্তু ঠিক কী পরিমাণ মানুষ দেউলিয়া হবে তা নির্ধারিত। এজন্য সুদে জর্জরিত একটি সমাজে রাতদিন টাকা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলতে থাকে এবং কেউ এই রেসে পিছিয়ে পড়লেই সে দেউলিয়ার কাতারে পড়ে যায়।

টাকা (বা ঋণ) বাড়া-কমার সাথে অর্থনৈতিক উৎপাদন বা জিডিপি হ্রাস কিভাবে সংশ্লিষ্ট তা ভালোভাবে বুঝতে হলে একটি দেশের অর্থনীতিতে দেউলিয়াত্বের প্রভাব দেখুন। যখন কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায় তখন সেখানে কর্মরত লোকজন চাকরি হারিয়ে ফেলে। সমগ্র অর্থনীতিতে এই ধারা শুরু হলে বিশাল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন বসে থাকে। এই কর্মহীন জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা যেহেতু কম, তারা কেনাকাটাও করতে পারে কম। এভাবে ক্রয়সীমা কমে গেলে বাজারে সবরকম ব্যবসার ক্রেতা কমে যায়। আর ক্রেতা কমে গেলে বেচা বিক্রিও কমে যায়। তাই কোম্পানিগুলো লোকসানে লোকসানে কঙ্কাল হয়ে যায়। এভাবে নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ আরও কমে যায়। ব্যবসায় লাভ না হলে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করবেই বা কেনো? পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে দেশে বেকারত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

এই পুরো দুষ্টচক্রকে দুই শব্দে বলা হয় 'অর্থনৈতিক মন্দা'। আর এই মন্দার দুষ্টচক্র থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে ক্রমাগত ঋণ বৃদ্ধি করা। কারণ, নতুন ঋণ তৈরি হওয়া ছাড়া নতুনভাবে টাকা উৎপাদন হবে না। আর নতুন টাকা সৃষ্টি হওয়া ছাড়া পুরানো ঋণের সুদ পূরণ হবে না এবং দেউলিয়ার হিড়িকও ঠেকানো যাবে না। ঋণ বৃদ্ধি পাবার আরেকটি উপকারী দিক হচ্ছে সকলের হাতে হাতে টাকা আসা। এভাবে মোট বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতিও দ্রুত চাঙ্গা হয়।

ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার বাস্তব ইতিহাস

টিকা – বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা

২০০৭-০৮ সালে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ধ্বসের একটি সংগঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী এই ধ্বসের সূতিকাগার ছিল আমেরিকা। সেবার শেয়ার মার্কেটের রেকর্ড পরিমাণ দরপতন ঘটে, বন্ধ হয়ে যায় অনেক ব্যাংক এবং সরকারকে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেইল আউট প্যাকেজ ঘোষণা করতে হয়। এই ধ্বসের মোট ক্ষতি ধরা হয় প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার। কিন্তু কিভাবে তা সংগঠিত হলো?

২০০৭ সালের পূর্বে আমেরিকার ব্যাংকগুলো সম্পদশালী হবার প্রতিযোগিতা করে ঋণ নেওয়ার একেবারে অনুপযোগী ব্যক্তিদেরও গৃহঋণ দিতে থাকে। কেউ দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে তা নিয়ে ব্যাংক তখন চিন্তিত ছিল না। কারণ, ঋণের বিপরীতে কেনা বাড়িটি বন্ধক রাখা থাকতো এবং কেউ দেউলিয়া হলে বাড়ির মালিকানা ব্যাংক অর্জন করতো। এদিকে বছর বছর বাড়ির দাম কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছিল দেখে গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করুক কি দেউলিয়া হোক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাংকের লাভ থাকতো। এই হিসেব করে ব্যাংক কাউকে ফেরাতো না। এক পর্যায়ে যার ঋণ পরিশোধ করার মত সামর্থ্য ছিল না তাকেও ব্যাংক গিয়ে ঋণে বাড়ি কেনার অনুমোদন দিতে লাগলো। ব্যাংক খুব খুশি। কারণ এই ব্যবসায় কোনো লোকসান নেই। গ্রাহকও খুব খুশি। কারণ যার কোনো দিন নতুন বাড়ি করবার সামর্থ্য ছিল না সেও একটি বাড়ি পেয়ে গেল।

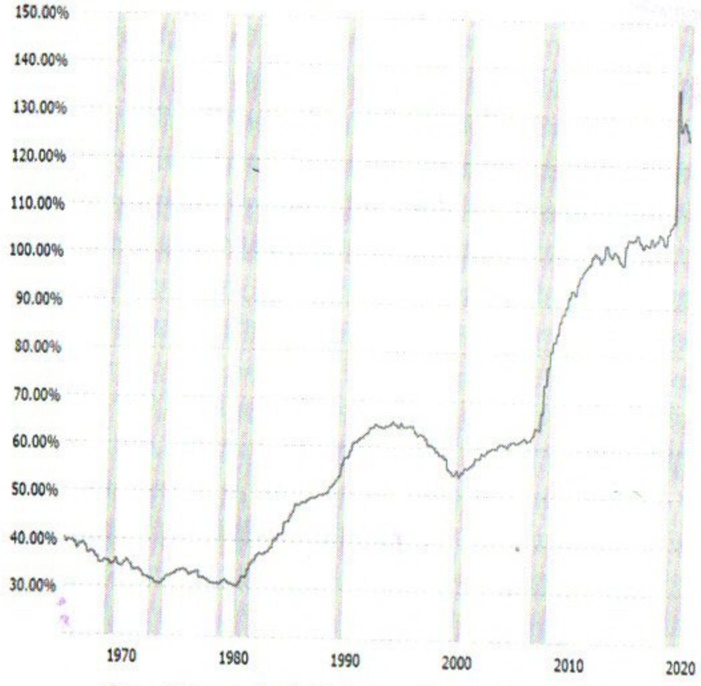
এই ধারা চলতে চলতে এক পর্যায়ে সীমা অতিক্রম করে ফেলে এবং গণহারে গ্রাহকরা দেউলিয়া হওয়া শুরু করে। একসময় এত বেশি বাড়ির মালিক দেউলিয়া হয়ে পড়ে যে বিক্রির লিস্টে জমা পড়া বাড়ির সংখ্যা ক্রেতার সংখ্যার চেয়ে বেড়ে যায়। ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হলে ইতিহাসে সবসময় যা হয়েছিল তাই হয়। বাড়ির দাম কমা শুরু করে। বাড়ির দাম কমা শুরু হলে ব্যাংকগুলোকেও লোকসান গুনতে হয়। ব্যাংকের পাশাপাশি লোকসান শুরু হয় বীমা কোম্পানিরও কারণ ব্যাংক ঋণগুলো বীমা করা ছিল। লোকসান শুরু হলে কর্মী ছাঁটাই শুরু হল, বেকারত্ব বৃদ্ধি পেল এবং আরও বেশি দেউলিয়াপনা বৃদ্ধি পেল। ফলশ্রুতিতে আরও কমে গেল বাড়ির দাম।

ঘর বাড়ির দাম কমে গেলে ঋণ নেওয়া ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় দেউলিয়া হয়ে যেতে থাকে। কারণ ১ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে একটি ঘর কিনে কেউ দেখল তার ঘরের মূল্য কমে হয়ে গেছে ৭০ লাখ টাকা। অর্থাৎ, আপনি ১ কোটি

টাকা দিয়ে ৭০ লাখ মূল্যের একটি বস্তু কিনে ১ কোটি টাকার উপরে সুদ প্রদান করছেন। এই ক্ষেত্রে আপনি ঘর বিক্রি করেও ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন না। তাই এই ঋণ থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে দেউলিয়া হওয়া।

এভাবে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে একটি বড় ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়, যার নাম লেহমেন ব্রাদার। বিভিন্ন ফিন্যান্সিয়াল ডেরাইভেটিভের কারণে এই লস ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র এবং অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। এভাবে শুরু হয়ে যায় বিশাল মন্দা।

গর্তে পড়া অর্থনীতিকে বাঁচাতে আরো বড় গর্ত খোড়া লাগবে, এরকম ঐতিহাসিক অর্থনীতিতেই আমরা বাস করছি। বিশ্বাস হচ্ছে না? চলুন তবে আরেকটা শিক্ষা সফর করে আসি।



চিত্র - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জি ডি পি'র তুলনায় শতকরা ঋণের হার[৩০]

প্রথমত, আমরা বলেছি টাকা উৎপাদন যেহেতু ব্যাংকের থেকে হয় এবং এই টাকা ঋণের আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া

৩০ https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S

ছাড়া অর্থনীতি চলবে না। উপরের চিত্রটি আমেরিকার জিডিপির তুলনায় সরকারি ঋণের চার্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, সময়ের সাথে এটি উপরের দিকে উঠছে। একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হলো, সময়ের সাথে অর্থনীতি বড় হলে, ঋণও বাড়বে, তাই এমন হলে চমকে উঠার কারণ নেই। কিন্তু এই চমৎকার কিন্তু ভয়াবহ চার্টটা মোট ঋণের চার্ট না। এটি আমেরিকার জিডিপির তুলনায় শতকরা ঋণের হারের চার্ট। সোজা বাংলায়, ১৯৭০ এর দশকে আমেরিকাতে তার মোট দেশজ উৎপাদনের মাত্র ৩০% সরকারি ঋণ ছিল আর ২০২০ এর দশকে সেটা ১৪০% ছাড়িয়ে যাচ্ছে!

চার্টে লক্ষ্য করুন, ঋণের পরিমাণ মাঝে মাঝে কমেছেও। একটু খেয়াল করলে দেখবেন, চার্টে ছাই রঙের স্তম্ভ আঁকা আছে। এই স্তম্ভের মানে হচ্ছে সেই সময়টা ছিল অর্থনৈতিক মন্দার সময়। মোট ঋণের পরিমাণ কমে গেলে সাধারণত অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়ে যায় এবং তার পরেই মন্দা ঠেকাতে সরকার আরও বেশি ঋণ নিয়ে অর্থনীতি চাঙ্গা করার চেষ্টা করে। আরো ভয়ানক তথ্য হল, এই চার্ট সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে পারে নাই! কারণ এতে বেসরকারি ঋণ যুক্ত করা হয় নাই।

একবার ভাবুনতো ঋণজালে কত গভীরভাবে জর্জরিত এই জাতি!

ঋণ বৃদ্ধি করার উপকার অনস্বীকার্য। সব ব্যাংকই চায় মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে, কিন্তু ঋণে জর্জরিত একটি সমাজে ঋণ বৃদ্ধির উপায় কী? সবচেয়ে প্রচলিত উপায়টি হচ্ছে সুদের হার হ্রাস করা। যখনি কোনো অর্থনীতিতে মন্দা ভাব দেখা দেয়, তখন এই সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমে যে সিদ্ধান্তটি নেয় তা হচ্ছে সুদের হার হ্রাস করা। সুদের হার কিভাবে হ্রাস করা হয় তার বিস্তারিত আলোচনা এই বইয়ের সাধ্যের বাহিরে। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে নতুন টাকা ছাপিয়ে সহজে ঋণ দেয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার হ্রাস করে। ইংরেজিতে যাকে বলে Monetary Easing বা এখন Quantitative Easing. Monetary Easing বা Quantitative Easing এর ফলে ঋণে সুদের হার কমার সাথে সাথে নতুন টাকা অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। সুদের হার কম থাকার আরেকটি সুবিধা হচ্ছে ব্যবসায়ীরা কম খরচে বিনিয়োগ করতে পারে। তাই সুদের হার কমালে নতুন টাকা সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এভাবে অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

পরিস্থিতি ভালো হয়ে গেলে সুদের হার পুনরায় কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়, কিন্তু সুদের হার বৃদ্ধি করা হলে ঋণের পরিমাণ আবার কমে আসে।

তখন আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও কমে আসে এবং পুনরায় সুদের হার কমানো হয়। সুদের হার হচ্ছে অনেকটা সঞ্চয়ের মত। বিপদের দিনে যেমন সঞ্চয় কমে আসে ঠিক তেমনি মন্দার সময় সুদের হারও কমে আসে। আর সুসময়ে যেমন আমরা সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করি,ঠিক তেমনি অর্থনীতির ভালো সময়ে সুদের হার বৃদ্ধি করার প্রস্তুতি নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এই পদ্ধতিটির নাম মনেটারি পলিসি বা মুদ্রানীতি যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সুদের হার হ্রাস বৃদ্ধি করে অর্থনীতিতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মনেটারি পলিসি মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব ফেলে না। এটি কেবলমাত্র সাময়িক সময়ের জন্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়।

'Whoever controls the volume of money in our country is the absolute master of all industry and commerce...when you realize that the entire system is very easily controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not have to be told how periods of inflation and depression originate.'
– James A. Garfield
20th president of the United States

'আমাদের দেশের টাকার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষমতা যার হাতে, সে সব শিল্প এবং বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সর্বময় কর্তা... আপনি যখন বুঝতে পারবেন কিভাবে শীর্ষে থাকা অল্প কিছু ব্যক্তি দ্বারা পুরো সিস্টেমটা খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তখন আপনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না কোথা থেকে মূল্যস্ফীতি এবং মন্দা সৃষ্টি হয়।'

— জেমস এ. গারফিল্ড
বিশ তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি

'If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered.

Thomas Jefferson (1743-1826)
Founding Father & 3rd President of the USA

'আমেরিকানরা যদি কোনোদিন বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে দেশের টাকা ছাপানোর ক্ষমতা দেয়, তাহলে ব্যাংক ও তাদের দোসর সংস্থাগুলো মিলে প্রথমে মূল্যস্ফীতি এবং তারপরে মূল্যহ্রাস করে জনগণের সব সম্পদ

হাতিয়ে নিবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সন্তানরা তাদের পূর্বপুরুষদের জয় করা ভূমিতেই গৃহহীন হয়ে পড়ে।'

— থমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬)
মার্কিন জাতির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ও তৃতীয় প্রেসিডেন্ট

ফিসকাল পলিসি

মুদ্রানীতি ছাড়াও মন্দা ঠেকাতে নেওয়া হয় ফিসকাল পলিসি বা সরকারি উদ্যোগ। এই পলিসিতে ভাতা ও অনুদান বৃদ্ধি, কর মওকুফ, প্রণোদনা প্রদান করা হয়। পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে সরকারের আয় কমে যায় এবং ব্যয় বেড়ে যায়। অন্যকথায়, সরকার নিজেই ঋণ নিয়ে অর্থনীতিতে টাকা ছিটিয়ে দেয়। এভাবে মানুষের হাতে হাতে নতুন টাকা প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ– সরকার যদি নতুন রাস্তাঘাট তৈরি করে তাহলে শ্রমিকদের বেতন এবং কাঁচামাল ক্রয় বাবদ নতুন টাকা অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। আবার সরকার যদি বেকারদের অনুদান দেয় এই টাকা বেকারভাতা রূপে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। মানুষের হাতে টাকা আসলে তারা তা ব্যয় করে। এভাবে অর্থনীতিতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ক্রেতাদের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে বাজারে বেচাকেনা বৃদ্ধি পায়। এভাবেই ব্যবসাগুলো লাভের মুখ দেখতে থাকে। বেচা বিক্রি বৃদ্ধি পেলে ব্যবসায়ীরা নতুন কর্মী নিয়োগ দেয় এবং নতুন প্রজেক্টে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। সব মিলিয়ে অর্থনীতি প্রাণ ফিরে পায় ও বেকারত্বও কমে যায়।

১. বিনিয়োগ, ভাতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মন্দার সময় ট্যাক্স কর্তনও করা হয়। ট্যাক্স যতো কমানো হয় ভোক্তাদের হাতে হাতে তত বেশি টাকা থাকে এবং বেশি বেশি কেনাকাটা করে। ট্যাক্স কম নিলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতেও টাকা বেশি থাকে। তাদের এই টাকা খরচ বা বিনিয়োগ করা হলে অর্থনীতি গতি ফিরে পায়।

২. অর্থনীতি চাঙ্গা হলে বেশি বেশি ট্যাক্স আদায় করে সরকার ঋণ শোধ করে দিবে এমনটাই নিয়ম। তবে এই নিয়মের বাস্তব প্রয়োগ খুব কম। সাধারণত সরকার ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে না, বরং দুঃসময়ে ঋণ বেশি নেয় এবং সুসময়ে ঋণ কম নেয়। কারণ, সুদের হার যদি জিডিপি বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম হয় ঋণের বোঝা কোনো সমস্যা না।

মনে করুন, আপনার কাঁধে একটি বোঝা আছে, এর ওজন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু একই সময়ের আপনার শক্তি দ্রুতার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় ধীরে ধীরে বোঝাটি হালকা মনে হবে। তেমনি

করে সরকারের (বা রাজ্যের) জিডিপি বছর বছর ৫ শতাংশ, আর সুদ ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দিনে দিনে ঋণের বোঝা হালকা হয়ে যাবে। তাই চলমান ট্যাক্সের হারেই সব ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করার পাশাপাশি উন্নয়ন ব্যয়ও খানিকটা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত জিডিপির বৃদ্ধি দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধন করে। মানুষের জীবন যাপনে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেই তুলনায় ঋণের হিসেব নিকেশ দৃশ্যমান না। আমরা খালি চোখে তা দেখতে পারি না। সে কারণে সরকার ঋণ কমানোর মতো কষ্টকর সিদ্ধান্তে না গিয়ে জিডিপি বৃদ্ধির দিকে মনযোগী হয়ে থাকে। তাছাড়া ঋণ শোধ করা মানে হচ্ছে অর্থনীতিতে টাকার পরিমাণ কমিয়ে ফেলা। তাই খুব বেশি ভালো পরিস্থিতিতে পড়া ছাড়া কেউ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না।

৩. ক্রমাগত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ফিসকাল ও মনেটারি পলিসি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পার পাওয়া যায়। কিন্তু যখনই প্রবৃদ্ধির হার কমে আসে, সব তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। কারণ, জিডিপি বৃদ্ধির হার সুদের হারের চেয়ে কমে যাওয়া মানে ক্রমাগত ঋণের বোঝা ভারী হয়ে যাওয়া। তাই সরকারকে ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করতে হয় অথবা ঋণ বেশি নিতে হয়।

৪. এমন অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে (বর্তমান জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা)। তবে সুদের হার কমানোর জন্য প্রচুর টাকা ছাপাতে হয়। এই পলিসি দেশের জনগণের জন্য মোটেও কল্যাণকর না। তাছাড়া সুদের হার কমানোর একটি সীমা আছে। কমাতে কমাতে যখন একবারে শেষ সীমায় পৌছলে বেশি কিছু করার থাকে না।

৫. সরকারের ঋণ বৃদ্ধিরও সীমা আছে। ঋণের বোঝা বাড়লে ক্রেডিট রেটিং খারাপ হয়ে যেতে থাকে এবং সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন ঋণ নেওয়া কঠিন সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি এক পর্যায়ে সরকারও নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারে যা অর্থনীতিকে কালনাগিনীর মত দংশন করে (সম্প্রতি লেবাননে এবং অতীতে গ্রিস ও আর্জেন্টিনায় এমনটি হয়েছে)। অর্থাৎ, সরকার অনন্তকাল ঋণ নিয়ে অর্থনীতি চাঙ্গা রাখবে সেই স্বপ্নের আশায় গুড়ে বালি।

সব মিলিয়ে ফিসকাল পলিসি এবং মনেটারি পলিসি, উভয়ই ঋণের বোঝা অনেক বাড়িয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে ঝুঁকি বৃদ্ধি করে দেয়। তাই যে পলিসিই চলুক না কেন ফলাফল একটাই। আমরা সবাই ঋণ দাসে পরিণত হব। সেই পরিণতি ঠেকানোর কোনো পলিসি নেই 'বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সুদমুক্ত সমাজ গঠন ছাড়া।'

'Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist.'
— Kenneth E. Boulding
English-born American Economist & Educator

'যে ব্যক্তি মনে করে এই সসীম বিশ্বে কোনো চক্রাকার বৃদ্ধি অনন্তকাল চলতে থাকবে, সে হয় একজন পাগল অথবা একজন অর্থনীতিবিদ'।
— কেনেথ ই. বৌল্ডিং
আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ

শেষ কথা

আপনার যাপিত জীবনের চারিপাশে আধুনিক অর্থনীতি ও সুদের যে সুবিশাল জাল রয়েছে সেটি এই বই উন্মোচন করল কিংবা চেনাজানা জিনিসটাই এই বই নতুন করে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিল, এখন আপনি চাইলে

- সব ভুলে গিয়ে পুনরায় অতীত জীবনে ফিরে যেতে পারেন।
- জেনে-বুঝেও কিছুই পরিবর্তন না করে শুধু জ্ঞানটা নিজের ভেতরে রেখে কবর পর্যন্ত পৌছে যেতে পারেন।
- আলোকিত সমাজ গড়ায় বি-শা-ল ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই।

তবে, আমরা এক রাতে সব বদলে দিতে পারব না দেখে হাত পা গুটিয়ে থাকতে পারি না। আমরা সফল হব কি হব না তা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি প্রচেষ্টা করলাম নাকি পরাজয় মেনে নিলাম? তাই ভয়ে পিছপা না হয়ে সুদমুক্ত সমাজ গঠনে আন্তরিক ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব সবার নিকট এই প্রত্যাশা রইল।

খুব ছোট দুইটি সংগৃহীত ও পরিমার্জিত গল্প দিয়ে বইটি শেষ করছি।

ঈগল ও মোরগ

অনেক অনেক উঁচু এক পর্বতের চূড়ায় এক জোড়া ঈগল তাদের বাসা বানিয়েছিলো। তাদের বাসায় ছিল সদ্য পাড়া চারটি ডিম। প্রতিদিন সকালে তারা এগুলো রেখে খাবারের খোঁজে উড়ে যেত।

একদিন ঈগলরা যখন বাসার বাইরে ছিল তখন ভূমিকম্পে গোটা পাহাড় নড়ে উঠলো। এতে ঈগলের একটি ডিম বাসা থেকে পড়ে গেল। গড়াতে গড়াতে সেই ডিম এসে পড়লো পাহাড়ের নিচের এক মুরগির বাসায়।

মুরগি সেই ডিমটিকে নিজের মনে করে তার অন্যান্য ডিমের সাথে রাখল। যত্ন করে তা দিতে থাকলো। একদিন সেই ডিম ফুটে ঈগলের একটি সুন্দর বাচ্চাও বের হলো। মুরগির বাচ্চাদের সাথেই ঈগলের বাচ্চাটি বড় হয়ে উঠতে লাগলো।

ঈগলের বাচ্চাটি মুরগি মায়ের শেখানো কথায় সবকিছুই মুরগিদের মতই করত। কিন্তু সে ভেতর থেকে সবসময় অন্য কিছু অনুভব করতো। আকাশে একদিন ঈগল উড়তে দেখে সে মুরগি মাকে বললো, 'ইস! মা, যদি আমিও তাদের মতো উড়ে বেড়াতে পারতাম!' মুরগি মা হেসে উত্তর দিলো, 'তুমি কিভাবে উড়বে? তুমি তো মুরগি এবং মুরগিরা কখনো উড়ে না।'

ঈগল মাঝেমাঝেই তার স্বগোত্রীয়দের উড়ে বেড়াতে দেখতো এবং স্বপ্ন দেখতো সেও তাদের মতই উড়ে বেড়াবে। কিন্তু প্রতিবার সে এইকথা জানালে মুরগি পরিবার বলতো যে এটা একেবারেই অসম্ভব। ঈগল সেটাই বিশ্বাস করতে শিখলো এবং তার বাকি জীবনটা মুরগিদের মতই কাটিয়ে দিলো। কখনোই উড়ার চেষ্টা করেনি এবং এভাবেই একদিন সে মারাও গেল।

এটা আসলে আমাদের অনেকের জীবনের এটা চরমতম সত্য। আমরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য কিংবা সক্ষমতা সম্পর্কে জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না। তাই, যদি কখনো ঈগলের মতো উড়ার স্বপ্ন দেখেন, মুরগির কথায় কান দিতে যাবেন না।

এক হাজার আয়নার ঘর

রূপকথার গ্রামের নদীর ধারে একটি ঘর ছিল যার নাম 'এক হাজার আয়নার ঘর।' তার পাশের গ্রামে সুন্দর হাসিমাখা মুখের একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল যার নাম তার সুবর্ণা। সুবর্ণা সবসময় তার বাবা মার মুখে আয়না ঘরের গল্প শুনেছে কিন্তু কখনো তা দেখেনি। একদিন সে চিন্তা করলো যে ওই আয়নার ঘর দেখতে যাবে। কিন্তু একা একা যেতে সাহস না হওয়ায় তার সমবয়সী বান্ধবী অপর্ণাকে সাথে নিল। সুবর্ণার মত অপর্ণাও কখনো আয়না ঘর দেখেনি। আয়না ঘরের সামনে এসে তারা ঠিক করলো সুবর্ণা আগে ওই ঘরে ঢুকবে এবং সবকিছু দেখে বের হয়ে আসার পর অপর্ণা ঢুকবে।

সেই কথামতো সুবর্ণা ওই ঘরের ভেতর ঢুকল। ঘরে ঢুকেই তার চোখ ছানাবড়া। সে দেখলো ঠিক তারই মতো এক হাজার হাস্যোজ্জ্বল মেয়ে মিষ্টি মুখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে যা করছে বাকিরাও ঠিক তাই তাই করছে।

সব কিছু দেখে সে অনেক মজা পেয়ে বাইরে চলে এল এবং তার সাথী অপর্ণাকে বলল 'এমন সুন্দর জায়গা আমি আগে কখনো দেখিনি। আমার মত এক হাজার মেয়ে দেখা যায়। সবাই কত হাসিখুশি! সুযোগ পেলেই আবার এই জায়গায় চলে আসবো।'

সুবর্ণার বর্ণনা শুনে অপর্ণার মনে শংকা জাগলো। তাই কিছুটা আতংকিত মন নিয়েই সে 'এক হাজার আয়নার ঘর'-এ প্রবেশ করল। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে অপর্ণা আরো ভয় পেয়ে উঠল। সে খেয়াল করল ঠিক তারই মতো দেখতে এক হাজার মেয়ে ভয়ার্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অপর্ণা বলল- 'তোমারা কারা?' সাথে সাথে বাকি এক হাজার মেয়েও ওর দিকে তাকিয়ে মুখ নাড়ল কিন্তু কোন শব্দ করলো না! এবারে অপর্ণা আরো ভয় পেয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে এল এবং সুবর্ণাকে বলল, 'শিগগিরই বাড়ি চল, এটা খুব বাজে জায়গা। আমি আর কোনোদিন এখানে আসব না।'

আপনার জীবনটাও এই আয়না ঘরের মতো। আপনি যেভাবে জীবনকে দেখবেন, সেও ঠিক সে ভাবেই আপনার কাছে ধরা দিবে। যারা সাহসিকতা, ভালোবাসা এবং জয় করার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে যারা সামনে এগিয়ে যায়, জীবনও তাদের কাছে অনেক সম্ভাবনাময় হয়ে ধরা দেয়। আর আতঙ্কিত ও ভয়ার্ত ব্যক্তির কাছে সবকিছু কঠিন এবং সম্ভাবনাহীন রূপেই ধরা দেয়।

আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে উত্তম মানসিকতা এবং অর্থনৈতিক জীবন দান করুন। আমিন।

শব্দকোষ ও প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা

জিডিপি (GDP)

একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে (যেমন-এক বছরে) কোনো অঞ্চলের ভেতরে উৎপাদিত সব পণ্য ও সেবার মোট বাজারমূল্যকে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বলে। জিডিপি একটি অঞ্চলের অর্থনীতির আকার নির্দেশ করে। বিবেচ্য অঞ্চলটি যদি একটি দেশ হয়, তবে একে মোট দেশজ উৎপাদন নামেও ডাকা হয়।

জিডিপি = ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + (রপ্তানি আমদানি)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth or GDP growth)

একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অঞ্চলের ভেতরে সব পণ্য ও সেবার মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে বলা হয় সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

উদাহরণ- ময়না দ্বীপের সবে মিলে গত বছর উৎপাদন করেছেন ১০০ কোটি টাকার পণ্য ও সেবা। এই বছর দ্বীপের মোট উৎপাদন হচ্ছে ১১০ কোটি টাকার পণ্য ও সেবা। তার মানে, এই বছর ময়না দ্বীপের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি (Inflation)

একটি অর্থনীতিতে সব ধরনের পণ্য ও সেবামূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে মূল্যস্ফীতি বলে।

মূল্যহ্রাস (Deflation)

একটি অর্থনীতিতে সব ধরনের পণ্য ও সেবার মূল্য কমে যেতে থাকলে তাকে মূল্যহ্রাস বলে।

মুদ্রাস্ফীতি (Increase in Money Supply)

কোনো অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধিকেই মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যস্ফীতি উভয়ই খুব নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ কোনো অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ সব পণ্য ও সেবার সরবরাহের তুলনায় বেড়ে গেলে মূল্যস্ফীতি ঘটে।

অর্থনীতিবিদ কেমারার (Kemmerer) এর মতে, 'যখন দেশে মোট মুদ্রার জোগান চাহিদার তুলনায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করে তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে'।

মনেটারি পলিসি (Monetary Policy)

মূল্যস্ফীতি, সুদের হার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারা গৃহীত পরিকল্পনাকে বলা হয় 'মানেটরি পলিসি' (Monetary Policy)

ফিসকাল পলিসি (Fiscal Policy)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বেকারত্ব হ্রাসের লক্ষ্যে সরকারের দ্বারা গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলিকে বলা হয় 'ফিসকাল পলিসি' (Fiscal Policy)

দেউলিয়া (Bankruptcy)

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন পাওনাদারের ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তখন এ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুদ (Interest)

ঋণদাতা মূল যে পরিমাণ অর্থ ধার দিয়েছে তার তুলনায় বাধ্যতামূলক বাড়তি (বা কম) অর্থ ফেরত চাইলে, এই ফেরত চাওয়া বাড়তি (বা কম) অংশকেই সুদ বলে।

ঋণদাতা যখন ঋণগ্রহীতা থেকে বাধ্যতামূলক বাড়তি আদায় করেন তখন ঋণদাতা হচ্ছেন সুদ ভক্ষণকারী। ঋণগ্রহীতা যখন ঋণদাতাকে বাধ্যতামূলক কম প্রদান করেন তখন ঋণ গ্রহীতা হচ্ছেন সুদ ভক্ষণকারী।

ব্যবসা (Business)

ব্যবসা বলতে সেই সংগঠনকে বুঝায়, যা অর্থের বিনিময়ে ভোক্তাকে পণ্য বা সেবা কিংবা, দুটো সুবিধাই প্রদান করে।

সুদের সাথে ব্যবসার একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে ব্যবসায় দুইটি ভিন্ন পণ্য লেনদেন হয় কিন্তু সুদে একই পণ্য কম-বেশি লেনদেন হয়।

চক্রবৃদ্ধি বা সূচকীয় বৃদ্ধি (Exponential Increase)

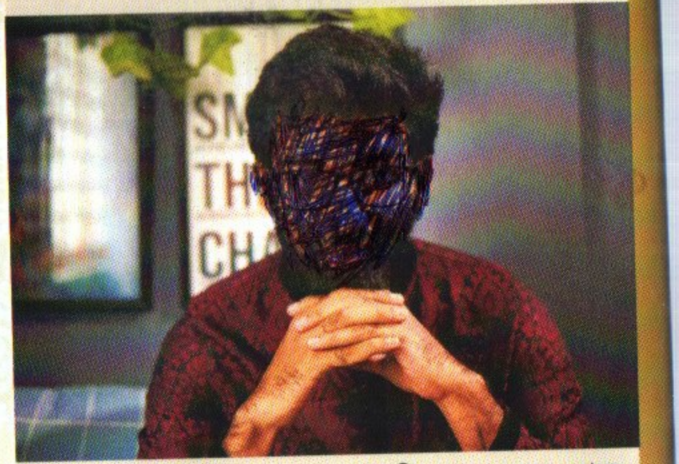
যখন সময়ের সাথে সাথে কোনো বস্তুর বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্ব পরিমাণের সমানুপাতিক হয় তখন বৃদ্ধিকে চক্র বৃদ্ধি বলে।

যেমন একটি দেশের জনসংখ্যা বছরে ১০% বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা ১ কোটি হলে এক বছর পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১ কোটি দশ লক্ষ, দুই বছরে হবে ১ কোটি ২১ লক্ষ, তিন বছর পরে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ। এভাবে প্রতি বছর মোট জনসংখ্যার পরিমাণ অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকবে থাকবে।

চক্রবৃদ্ধিকে নিম্নের ফাংশন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে,

$y=(1+r)^t$ এই ফাংশনে t হচ্ছে সময় এবং r হচ্ছে বৃদ্ধির হার।

সমাপ্ত



দীর্ঘ দশ বছর দেশে-বিদেশে অধ্যয়ন শেষে মোহাইমিন পাটোয়ারী বর্তমানে অর্থনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে বিবিএ সম্পন্ন করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'চার্টার্ড ফাইনান্সিয়াল এনালিস্ট' প্রোগ্রামে যুক্ত হন। অর্থনীতি এবং ফাইনান্সের পাশাপাশি গণিতের প্রতি রয়েছে তাঁর ঝোঁক। সিএফএ অধ্যয়নরত অবস্থায় দ্বিতীয় স্নাতক প্রোগ্রামের জন্য তিনি গণিত বিভাগে নাম লেখান উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২০১৬ সালে স্নাতকোত্তর গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের সেরা দশে অবস্থানের পুরস্কার অর্জন করেন। ২০১৭ সালের জুন মাসে তিনি সিএফএ পরীক্ষার তৃতীয় এবং শেষ ধাপ সম্পন্ন করেন।

তাঁর জীবনের ক্ষুদ্র একটি অপূর্ণতা হচ্ছে গণিতে স্নাতক সম্পন্ন করতে না পারা। স্নাতক করা অবস্থাতেই নরওয়ে স্কুল অফ ইকনমিক্সে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য তার ডাক পড়ে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি নিশীথ সূর্যোদয়ের দেশে পাড়ি জমান। অতঃপর নরওয়ে স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে দ্বৈত মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য তিনি যন্ত্রের দেশ জার্মানির স্বনামধন্য 'মানহাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে' পড়তে যান। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, ভ্রমণ, শিক্ষকতা এবং ভাষা শিক্ষার জগতেও তিনি একজন সক্রিয় ব্যক্তিত্ব। ২০১৮ সালে চাইনিজ ব্রিজ কম্পিটিশনে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থানসহ খেলাধুলার জগতেও রয়েছে তাঁর একাধিক পুরস্কার।

বর্তমানে অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাংলা ভাষায় অর্থনীতির জগতকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। বই লেখার পাশাপাশি সংবাদপত্রেও তিনি নিয়মিত কলাম লিখেন। সরল বাংলায় এবং গল্পের ভঙ্গিমায় তাঁর লেখাগুলো ইতোমধ্যেই পাঠকদের মন কেড়ে নিয়েছে।

(৭)

ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য

— মোহাম্মদ আমিন পাটোয়ারী

=> সুদে কোন ঝুঁকি নেই ?

It's well enough that people of the nation do not understand Our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before ~~tommoro~~ tomorrow morning.

— henri ford

University that is taught at university is not the real economics, It's a whole Second economics of how things really work.

— Richard werner, Central Bank watcher and Investment strategist, Author and researcher.

=> ceteris Paribas, money in circulation (29)

Greek philosopher says,

money was intended to be used in exchange, but not to increase at interest. And this term interest, which means the birth of money from money is applied to the breeding of money because the offspring resembles the parent. Wherefore ~~this~~ of all modes of getting wealth this is the most unnatural.

— Aristotal.

ব্যবসা vs সুদ

① ব্যবসা ও সুদ মূল্যের মধ্যে পার্থক্য

ব্যবসা — লোকসান

সুদ — মুনাফা নিশ্চিত

② সুদেও ঝুঁকি আছে, ব্যবসায়ও তো

ব্যবসা — লোকসান

সুদ — cheat করলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়

③ বস্তুগত পণ্যের ক্ষতি vs সুদের লেনদেন

ক্ষতি — Accident Damage হয়

সুদ — টাকার কোন ক্ষতি নেই

④ ব্যবসার পরিবর্তনশীলতা vs সুদ

ব্যবসা — ব্যবসার পরিবর্তন হতে পারে

সুদ — ব্যবসার পরিবর্তন হয় না

⑤ ব্যবসায়ী ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে vs সুদ

ব্যবসা — লোকসান হলেও — ভাড়া দিতে হয়

সুদ — সুদ পাওনা থাকে — হক থেকে যায় নিলে

⑥ ভাড়া vs সুদ

ব্যবসা — ভাড়া নির্দিষ্ট হতে পারে

সুদ — যেহেতু নির্দিষ্ট পরিমাণ পায়

⑦ ব্যবসা vs সুদ

ব্যবসা — নির্দিষ্ট Profit return নিশ্চয় সম্ভব নয়

সুদ — প্রাপ্তি নির্দিষ্ট Profit return নিশ্চয় সম্ভব

দাম কমলে বিক্রি বাড়ে ব্যবসায়ী যাবতীয় নিশ্চয় নয়

মাছ 800, ক্রেতা — 80 → মাছ 700, ক্রেতা — 70 → ?

ceteris paribus

বন্দরভাড়া

→ চাহিদা অনুযায়ী — ক্রেতা ও বিক্রেতা নির্ধারণ

Case ① মুদারাবা

100

4 ⇄ 4

100

12 month = 4 ⇄ 4

Case 2 ② অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা

4 4 → 8 — লাভ + লোকসান — Both equal — For 12 month

6 month Profit = 6 month loss

8 → 4 4

100

100

Case 3 : সুদে ঋণ

② 4 ⇄ 6

98

102

- সুদ দেওয়া লাগবে

After 12 month

76

124

- ব্যবসায়ে এটি হবেনা কারণ, -লোকসান হলেও এরকম অনেক কিছু থাকবে।

- অধিকাংশ মুদ্রা ধনীদের হাতে

100

100

4 ⇄ 6

At a time

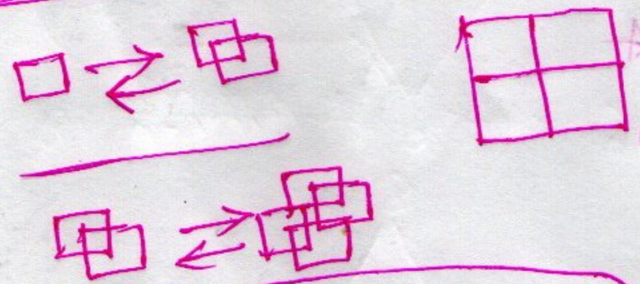
0

200

Total cash
200
0 loss

- ব্যবসায় এমন হবেনা

- জমির সুদ



- সুদ দিয়ে যে কোন ব্যবসা চলে না

সেরাপি (struck-out word) ক্লাইন্ট

- ব্যবস্থা

- ব্যবস্থা করে সুদ (struck-out word) করছে মানব কুল

Total cash
100

বাকি টাকা
= 10

10+10+10+... ... 0.2 .... 0.2 ...
2 ... 3 ... 0.00000 2

- এভাবে দিনে দিনে কমবে

- ব্যবসায়ে এই সাদর্শ System-এ আবার মুদ্রা release করার -নেই

⊛ - মুদ্রা যত কমবে সুদের চাহিদা তত বাড়বে

⊛ মুদ্রা যত কমবে ব্যবসায়িক লেনদেন সে অনুপাতে কমবে

- সুদের সময় কত টাকা যদি বেশি হলে তাহলে

mining
100 tk per year

1st year
1000 ⇄ 1100 tk
(+ বাজারে 100 টাকা দেয়া from mining)

2nd year
1100 ⇄ 1210 tk
(ঐ)

3rd year
1210 ⇄ 1331 tk
(ঐ)

100 tk করে প্রতি বছর বাজারে ছাড়া হলেও - একই Percentage - এ একটা amy প্রতি বছরে সুদি কারবারে আর্থিক প্রবাহ বিকাশ করে না, একসময় সব মুদ্রা সুদারুদের কাছে চলে যাবে প্রাপ্ত নেই 100 tk অনুযায়ী,

Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earn it ... he who doesn't ... Pay it.

— Albert Einstein.

[illegible]

I care not ~~what~~ what puppet is placed upon the throne of england to rule the Empire on which the sun never sets. The man who controls Britain's money supply controls the British Empire, and I control the British money supply.

— Nathan mayer rothchild

English-German Banker, Businessman and Financier (1777-1836)

The money Powers Prey upon the nation in times of Peace and conspire against it in times of adversity. It's more despotic than monarchy, more insolent than autocracy, and more selfish than bureaucracy. It denounces as public enemies, all who question it's method or throw light upon its crimes.

— Abraham Lincoln

16th American President

They know in advance when to create Panic to their advantage. They also know when to stop Panic. Inflation and deflation work equally well for them when they control finance.

— Charles A. Lindbergh

US congressman and lawyer (1859-1924)

Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws.

— Mayer Anselm Rothchild